

শিক্ষা অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ

মজার খেলায় বিজ্ঞান

এন. সি. ই. আর. টি কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তক অবলম্বনে



মজার খেলায় বিজ্ঞান

পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্য

শিক্ষা অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ

মে, ১৯৭৭

প্রকাশক

শিক্ষা অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পশ্চিমবঙ্গ

মুদ্রক
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-৫৪

ভূমিকা

পুঁথিগত বিদ্যার দিন আর নেই। এখন চাই হাতে-কলমে শিক্ষা। পুঁথিগত বিদ্যাটা অনেক সময়ই নীরস হ'য়ে পড়ে; কিন্তু হাতে-কলমে খেলার ছলে যে শিক্ষা, তাতে কোমলমতি ছাত্রদের মনে একটা উৎসাহ ও আনন্দ এনে দেয়।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ এই উদ্দেশ্যে নতুন পাঠ্য তালিকায় "Work Education" নামে একটি বিশেষ পাঠক্রম প্রবর্তন করেছেন।

আজকের যুগটা বিজ্ঞানের। অন্যান্য উন্নতিশীল দেশগুলির সাথে সমান তালে এগিয়ে যেতে হবে আমাদেরও। এজন্য আমাদের দেশের শিশুদের আধুনিক প্রণালীতে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

ইউনেস্কোর একটি শিক্ষা পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশ অনুসারে ভারতের 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং'-এর বিজ্ঞান বিভাগ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের জন্য বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন।

এই পরিকল্পনা অনুসারে আমরা তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর উপযুক্ত বই প্রকাশ করেছি। বর্তমান পুস্তকখানি পঞ্চম শ্রেণীর 'Science is doing' অবলম্বনে লিখিত।

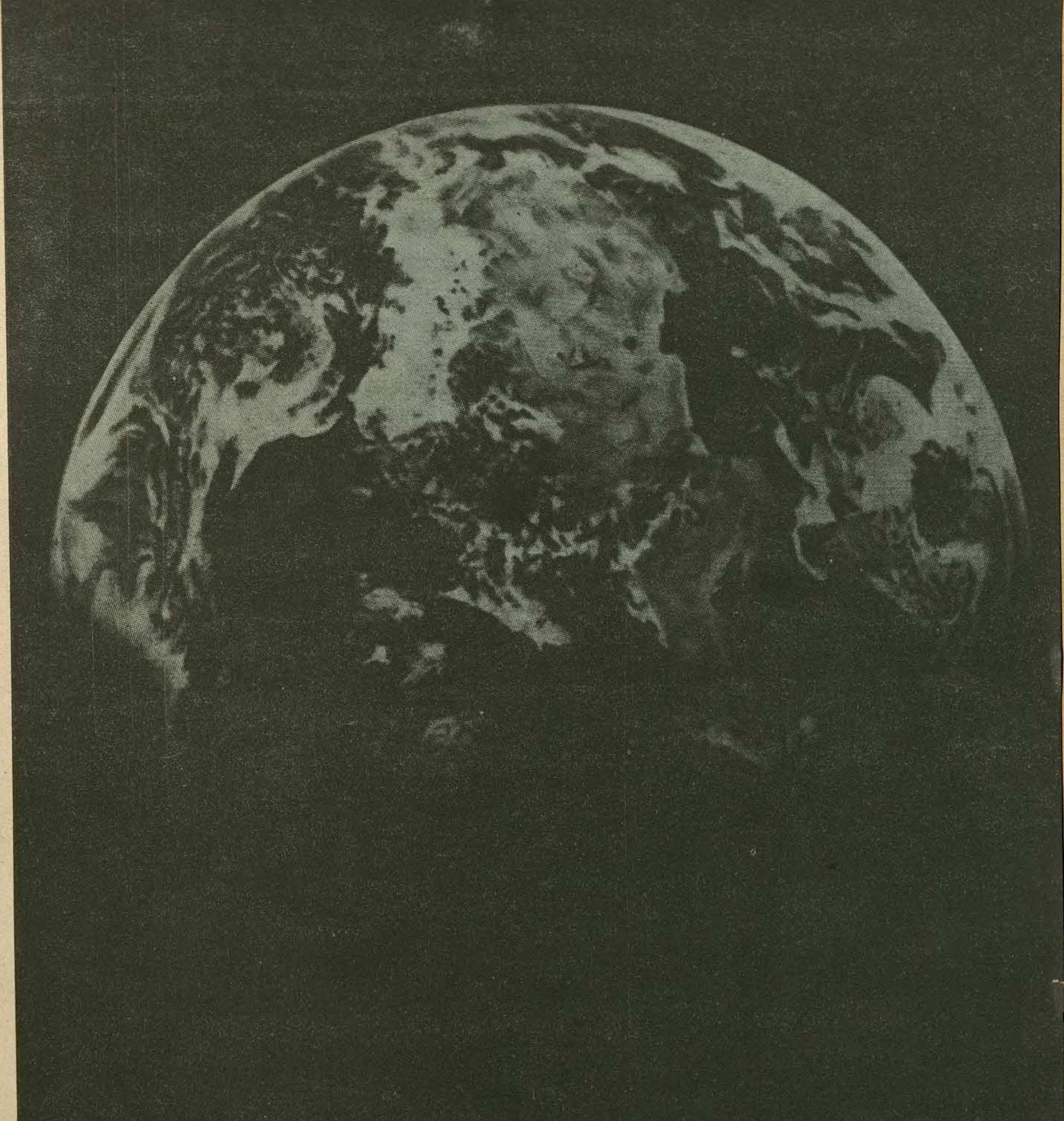
এই ধরনের প্রচেষ্টায় দেশের শিশুদের মনে সহজভাবে একটা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা দেখা দিলে আমাদের শ্রম সার্থক মনে করব।

নিশীথরঞ্জন কর
শিক্ষা অধিকর্তা
পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার

রাইটার্স বিল্ডিংস
কলিকাতা

সূচীপত্র

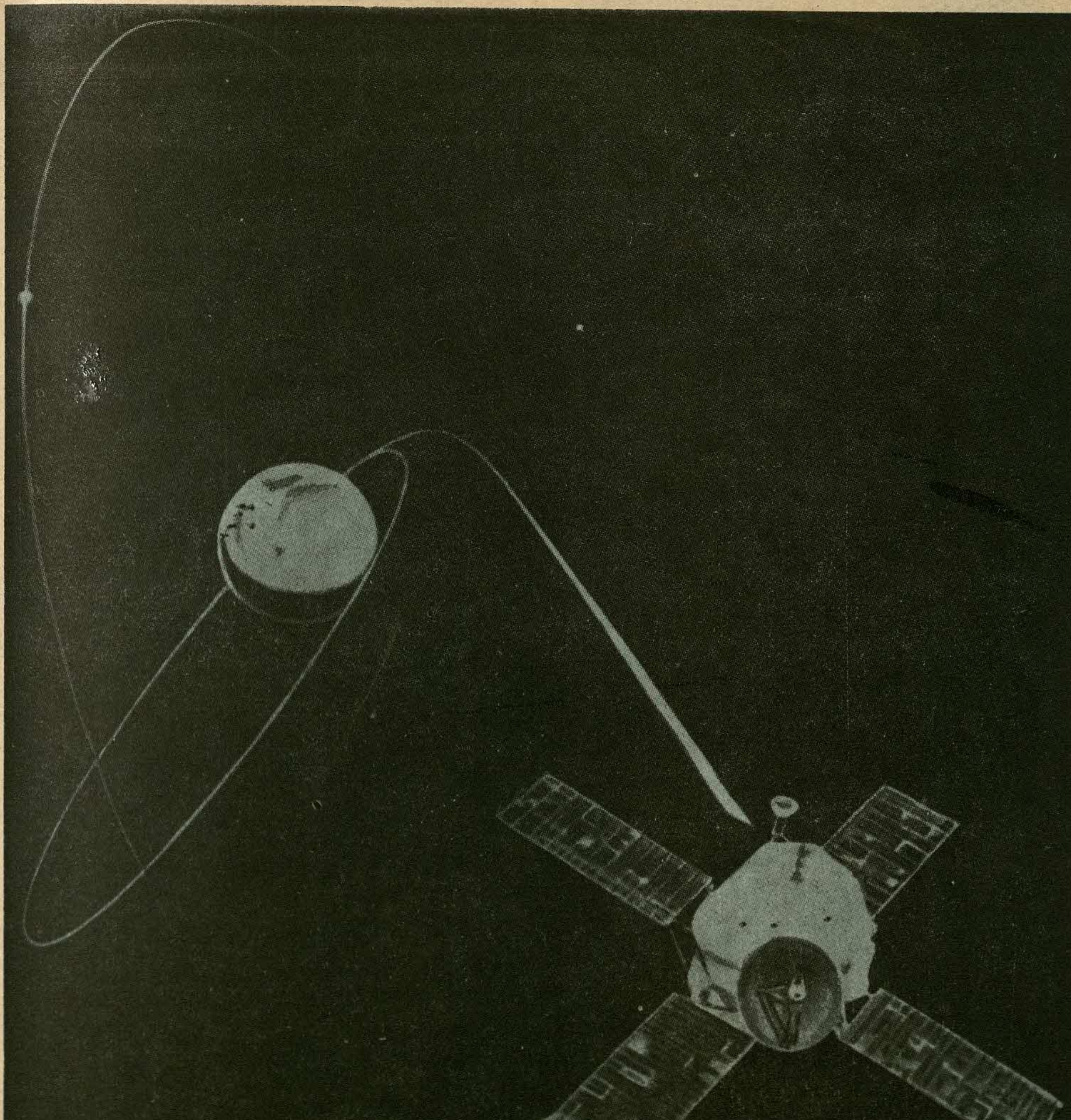
Paper gifted by Govt. of Norway
through UNICEF. Nubmer of copies printed 60,000 copies.



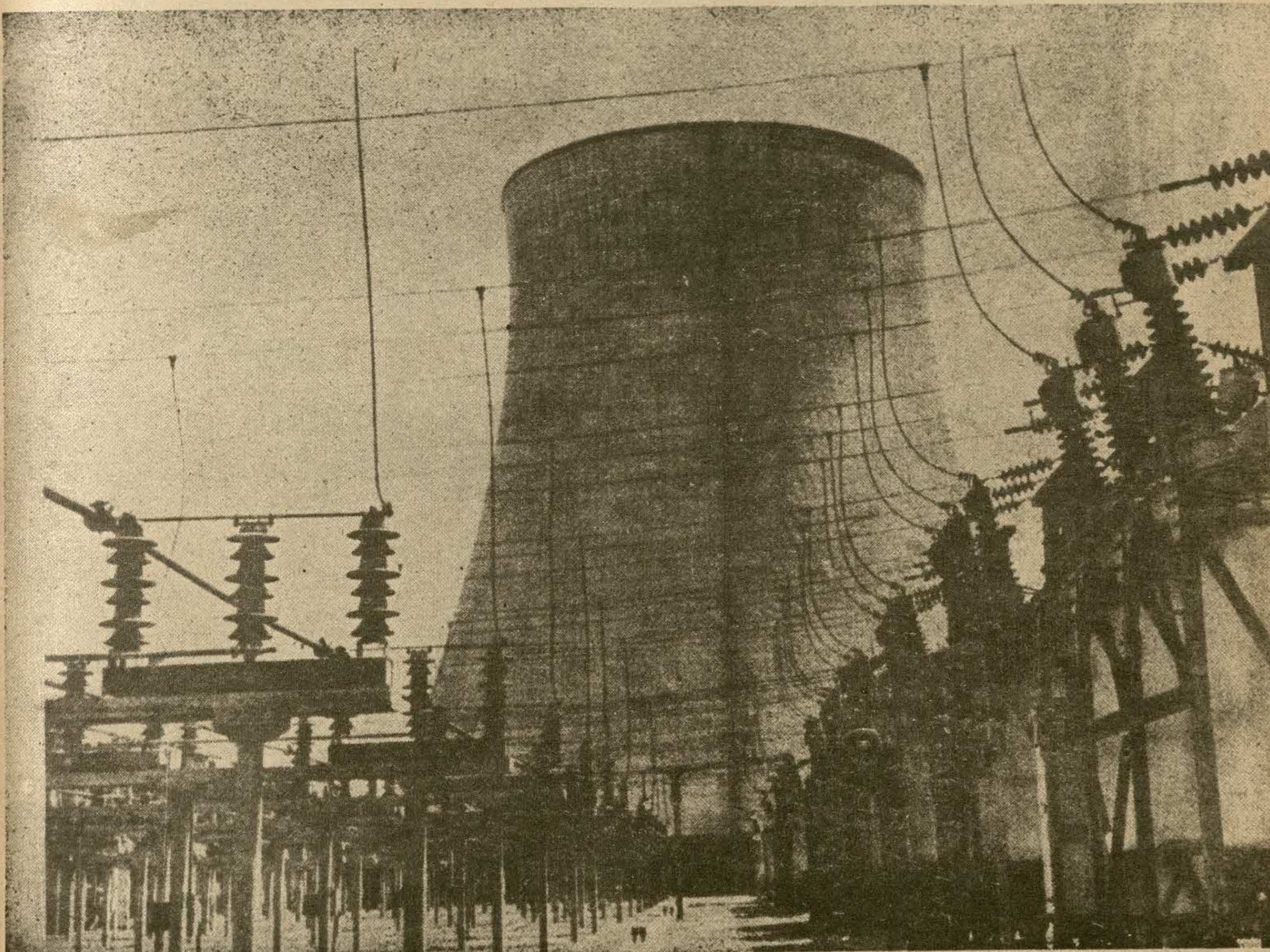
মহাকাশ থেকে তোলা পৃথিবীর ছবি



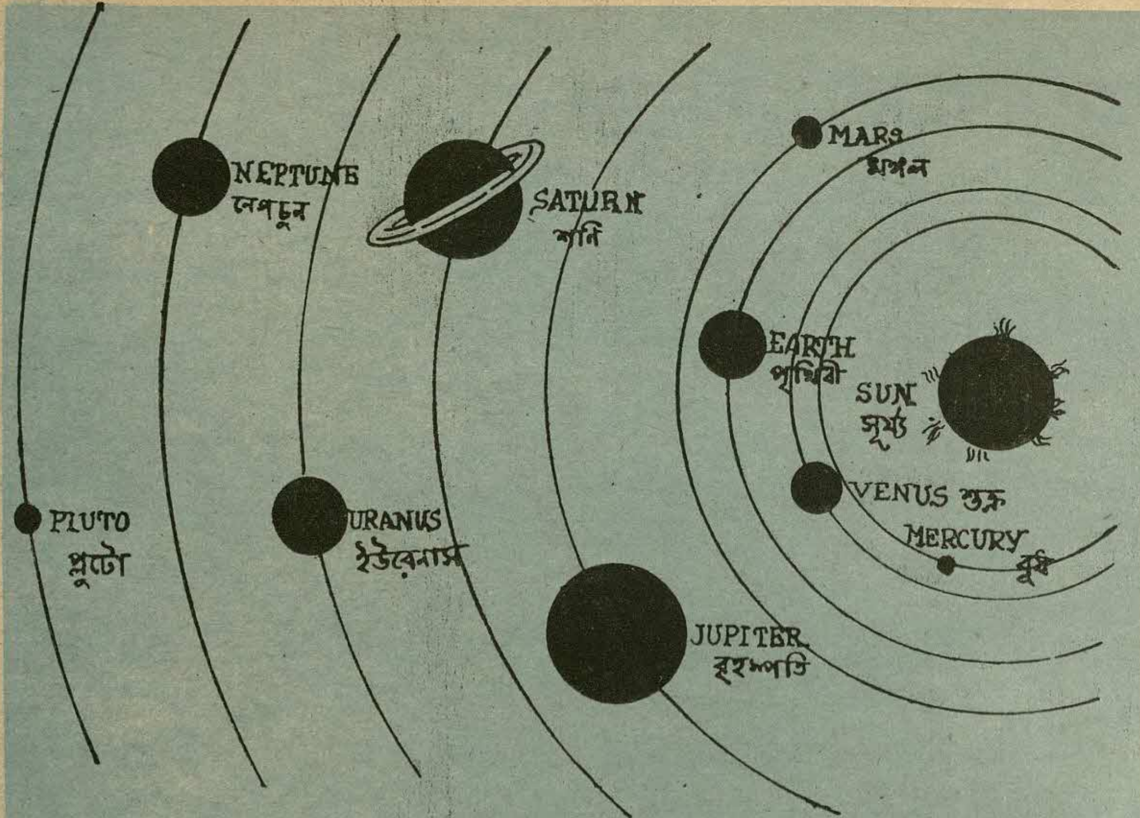
চাঁদের বুকে মানুষ



মহাকাশ ষ্টেশন

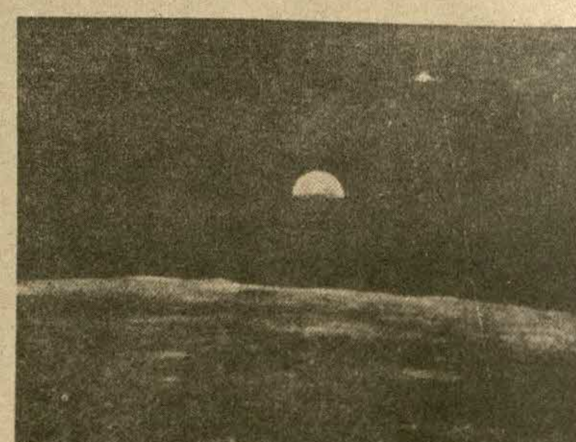


বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র—আমেদাবাদ



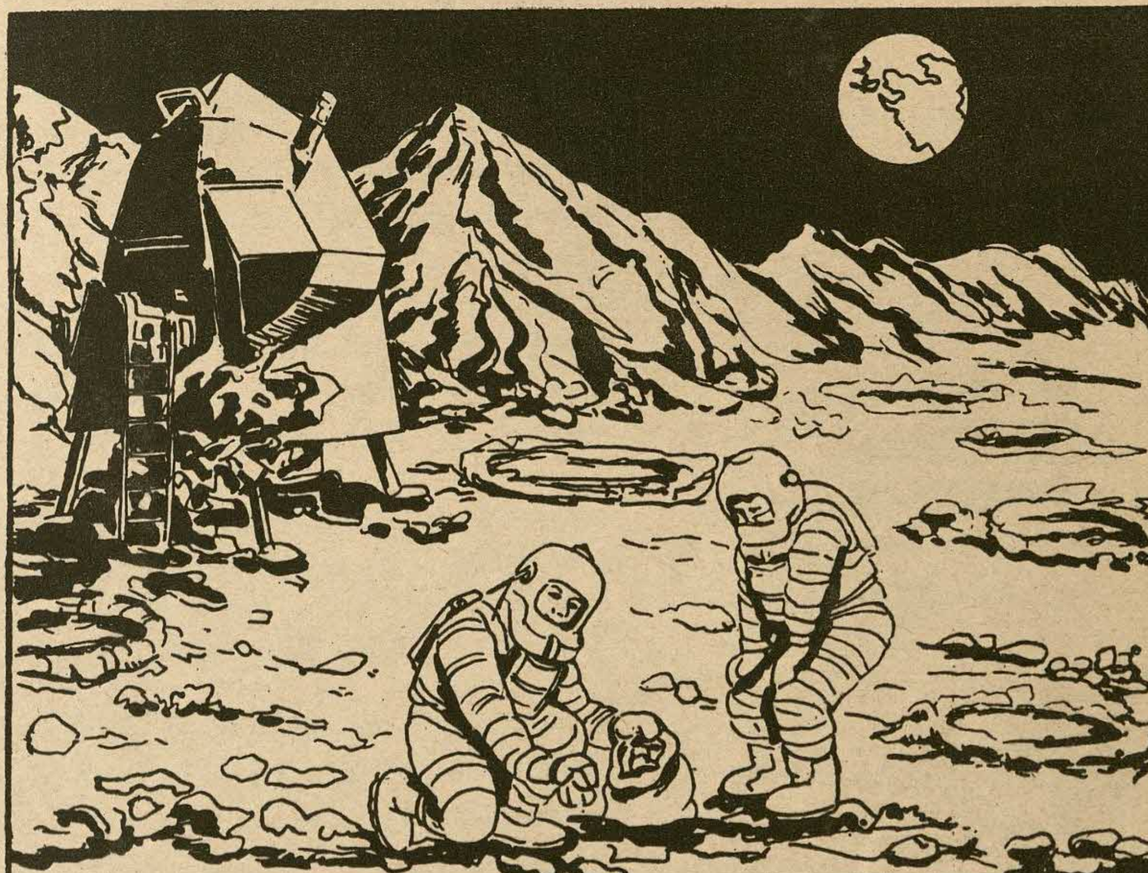


মহাকাশযান থেকে মানুষ চাঁদের বুকে নামছে



মহাকাশযানের চাঁদে অবতরণ

আমাদের পৃথিবী



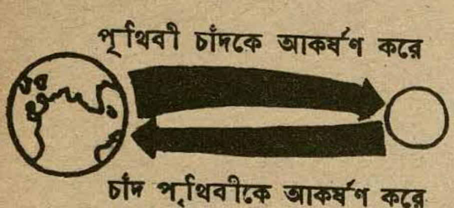
তোমরা এখন চাঁদের সঙ্গে খুব পরিচিত। চাঁদ আমাদের একটি পুরাতন বন্ধু। মহাশূন্যে বিচরণকারীরা তাঁদের অভিযান থেকে চাঁদ সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা আমাদের বলেন। চাঁদ থেকে তাঁরা পাথর সংগ্রহ করেছেন। এইসব পাথর পর্যবেক্ষণ ক'রে বিজ্ঞানীরা আমাদের চাঁদের ইতিহাস ব'লতে পারেন। চাঁদ থেকে আনা এইসব পাথরের কিছু কিছু নমুনা নিয়ে আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরাও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন।

চাঁদের দিকে তাকালে তুমি কতকগুলি কালো দাগ দেখতে পাবে। তোমরা হয়ত শুনেছ, এই কালো দাগ দেখতে একটা বুড়ীর মত। চাঁদের মা বুড়ী সুতো কাটছে ওখানে ব'সে। কিন্তু যাঁরা চাঁদে গিয়েছিলেন তাঁরা কোন বুড়ীকে দেখতে পাননি সেখানে। তাঁরা কেবল দেখেছেন পাহাড়, আগ্নেয়গিরির মুখ আর প্রশস্ত সমতলভূমি। তাঁরা সেখানে কোনও গাছপালা বা প্রাণীর সন্ধান পাননি।

চন্দ্র পৃথিবীর একটি স্বাভাবিক উপগ্রহ। এটা পৃথিবীর সিকি ভাগের কিছুটা বড়। আমরা এখন জানতে পেরেছি যে, পৃথিবীর মত চাঁদেও অনেক পাহাড় ও খনিজ পদার্থ আছে। কিন্তু এখানে কোন প্রাণী নেই। এস আমরা আলোচনা ক'রে দেখি, এখানে কোনও প্রাণী নেই কেন।



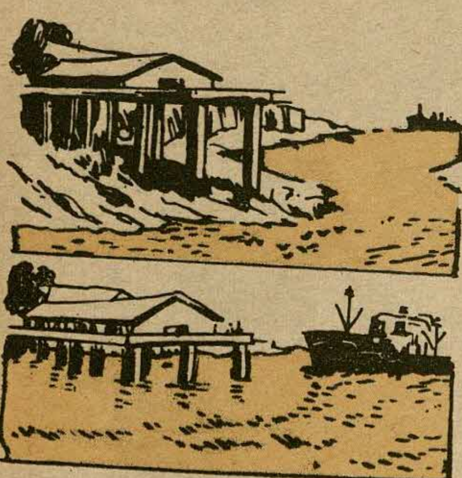
গাছপালা বা কোন প্রাণী বাতাস ও জল ছাড়া বাঁচতে পারে না। চন্দ্রমণ্ডলে বাতাস নেই, জলও নেই সেখানে। বিজ্ঞানীরা আরও আবিষ্কার করেছেন যে, চন্দ্রমণ্ডলে অত্যধিক গরম বা অতিরিক্ত ঠাণ্ডা। চন্দ্রমণ্ডলে কোনও প্রাণী না-থাকার এটাও একটা কারণ।



সূর্য পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহগুলিকে আকর্ষণ করে। আবার পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহগুলিও সূর্যকে আকর্ষণ করে। এইভাবে পৃথিবী চন্দ্রকে আকর্ষণ করে আবার চন্দ্রও পৃথিবীকে আকর্ষণ করে। বিশ্বের সমস্ত বস্তুই পরস্পরকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণের শক্তিকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বলা হয়।

বস্তুটা যত বড় হবে, তার আকর্ষণ শক্তিও হবে তত প্রবল। তাছাড়া, বস্তু দুটি যত কাছাকাছি হবে তাদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তিও হবে তত বেশি।

চন্দ্রের আকর্ষণের জন্য সমুদ্রে জোয়ার-ভাঁটা হয়।

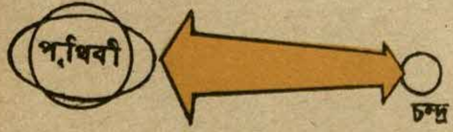


তোমাদের মধ্যে যারা সমুদ্রের ধারে বাস কর, তারা নিশ্চয়ই জোয়ার-ভাঁটার সঙ্গে পরিচিত। জল যখন তীরভূমির উপর ওঠে, তখন সেটা জোয়ার। আর তীর-ভূমির থেকে জল যখন নেমে যায়, তখন সেটা ভাঁটা। প্রত্যহ দু'বার জোয়ার ও দু'বার ভাঁটা হয়। জোয়ার-ভাঁটার জলের ব্যবধান কোথায়ও বেশি, কোথায়ও কম হয়।

জাহাজের নাবিকেরা যখন বন্দরে জাহাজ আনে, তখন তাদের জোয়ার-ভাঁটা সম্বন্ধে অবশ্যই জানা থাকা চাই। জেলেরা যখন সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়, তখন তাদেরও জোয়ার-ভাঁটা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

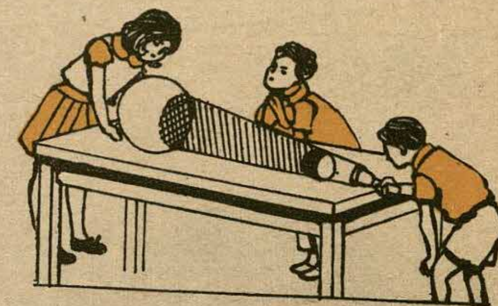
কি ক'রে জোয়ার-ভাঁটা হয়?

এস আমরা তা জানবার চেষ্টা করি—



পৃথিবী এবং চন্দ্রের ছবিটির দিকে তাকাও। পৃথিবীর জল, স্থল সব কিছুকে চন্দ্র আকর্ষণ করে। জল তরল পদার্থ এবং ওটা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরে যেতে পারে। চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর ছবিতে চিহ্নিত স্থানের জলকে নিজের দিকে টানে। তার ফলে সেই জায়গায় জোয়ার হয়।

যে জায়গা থেকে জল সরে যায় সেখানে হয় ভাঁটা।
পৃথিবী ঘুরছে। তার ফলে জোয়ার-ভাঁটারও পরিবর্তন হয়। সাধারণতঃ প্রত্যেক সাড়ে বারো ঘণ্টা অন্তর জোয়ার দেখা দেয়।



গ্রহণের ব্যাপারেও চাঁদের কাজ অনেকখানি। 'গ্রহণ' কি তোমরা জানো? তোমাদের দিদিমা হয়ত তোমাদের বলে থাকবেন, যখন রাহু চন্দ্র বা সূর্যকে গ্রাস করে তখন গ্রহণ হয়।

কিন্তু আমরা জানি, সূর্য বা চন্দ্রকে কেউ গ্রাস করে না। তাহলে গ্রহণ কি করে হয়?

এস আমরা তা দেখি

টেবিলের উপর একটা বল রাখো। বলটির আন্দাজ কুড়ি মিটার দূরে আর একটি ছোট বল রাখো। এবার একটি টর্চ নিয়ে ঐ ছোট বলটির মাঝামাঝি জায়গায় আলো ফেলো। বড় বলটির উপর কি দেখবে? দেখবে, ওটার খানিকটা জায়গায় আঁধার। এটা ঐ ছোট বলটিরই ছায়া বড় বলটির উপর।

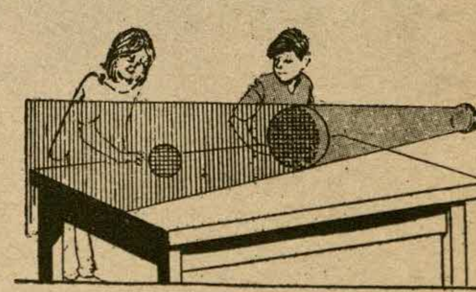
সূর্য ও চন্দ্রের গ্রহণও ছায়ার জন্য হয়।

চন্দ্রের গ্রহণ কিভাবে হয়?

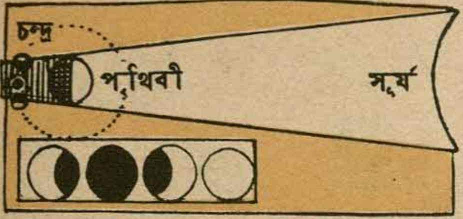
এস আমরা তা দেখি

টেবিলের উপর বড় একটি বল রাখো। ছোট আর একটি বল রাখো তোমার হাতে।

মনে কর ছোট বলটি চন্দ্র আর বড় বলটি পৃথিবী। তোমার ডান হাতে একটি জ্বলন্ত টর্চ নাও। এটা যেন সূর্য। এবার ছোট বলটিকে বড় বলের চারদিকে ঘুরাও। বড় বলটির উপর কোন ছায়া পড়ছে কি? ছোট বলটি যখন বড় বলটির ছায়ায় পড়ে বড় বলটি থেকে তখন ওটাকে দেখা যায় কি?



ঠিক এইভাবে পৃথিবীর ছায়া যখন চাঁদকে ঢেকে ফেলে, তখন চন্দ্রগ্রহণ হয়। এটা পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ। এই গ্রহণ একমাত্র পূর্ণিমার রাত্রে হয়। তখন পৃথিবীর যে দিকে সূর্য থাকে তার বিপরীত দিকে থাকে চন্দ্র।

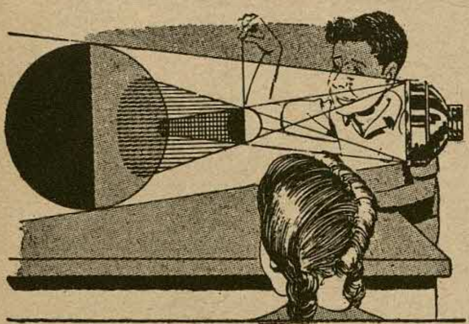


সূর্যগ্রহণ কিভাবে হয়?

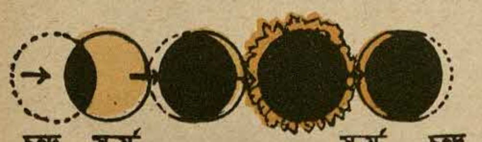
এস তাও আমরা দেখি—



একটা ছোট এবং একটা বড় বল নাও। বড় বলটি টেবিলের উপর রাখো। ছবিতে যেমন দেখানো হ'য়েছে তেমনিভাবে বড় বলটি থেকে আন্দাজ পাঁচ মিটার দূরে ছোট বলটিকে ঝুলিয়ে ধরো। ছোট বলটির থেকে আন্দাজ পনের মিটার দূরে একটা টর্চ বড় বলটির দিকে জ্বালো। এখানে টর্চটি যেন সূর্য, বড় বলটি যেন পৃথিবী আর ছোট বলটি যেন চন্দ্র।



টর্চের আলো ফেললে বড় বলটির উপর ছোট বলটির কোন ছায়া পড়ছে কি? বলটির এই অংশে টর্চের আলো পড়ছে কি?



এই অবস্থায় যে ব্যক্তি পৃথিবীতে চাঁদের ছায়ায় থাকবে সে সূর্যকে দেখতে পাবে না। তার-কাছে ওটাই সূর্যগ্রহণ। সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবী যখন একই সরলরেখায় থাকবে তখনই হবে সূর্যগ্রহণ। এটা একমাত্র অমাবস্যার দিনে হয়। চন্দ্র তখন পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে থাকে।

আমরা কি শিখলাম?

১। চন্দ্রমণ্ডলে পাহাড় পর্বত, আগ্নেয়গিরির মুখ ও চওড়া সমতল ভূমি আছে।

২। প্রত্যেক বস্তুই পরস্পরকে একটা শক্তি দিয়ে আকর্ষণ করে। এই শক্তিকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বলে।

৩। জোয়ার-ভাঁটা প্রধানতঃ চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণ শক্তিতে ঘটে।

৪। যখন চন্দ্রে পৃথিবীর ছায়া পড়ে তখন হয় চন্দ্রগ্রহণ।

৫। যখন পৃথিবীতে চন্দ্রের ছায়া পড়ে তখন হয় সূর্যগ্রহণ।

প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হবে—

১। শূন্যস্থানে উপযুক্ত শব্দ বসাও—

(ক) চন্দ্র পৃথিবীর আকারের......(অর্ধেক, একতৃতীয়াংশ, সিকিভাগ)

(খ) সমস্ত বস্তুই একটা শক্তি দিয়ে পরস্পরকে......(টানে, বিচ্ছিন্ন করে)

(গ) সূর্যগ্রহণ হয়......(পূর্ণিমার দিনে, অমাবস্যার দিনে)

(ঘ) চন্দ্রগ্রহণ হয়......(পূর্ণিমার রাত্রে, অমাবস্যার রাত্রে)

২। 'ক' স্তম্ভের বাক্যাংশের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভের বাক্যাংশ এমনভাবে সংযোগ কর যাতে একটি যথাযথ অর্থযুক্ত বাক্য হয়—

'ক'	'খ'
(অ) জোয়ার-ভাঁটা হয়...	(অ) প্রায় সাড়ে বারো ঘণ্টা অন্তর
(আ) জোয়ার হয়...	(আ) তখন চন্দ্রগ্রহণ ঘটে
(ই) যখন চন্দ্র ও সূর্যের মাঝখানে পৃথিবী আসে...	(ই) পৃথিবী ও সমুদ্রের উপর চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণ শক্তিতে
(ঈ) যখন সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে চন্দ্র আসে তখন...	(ঈ) সূর্যগ্রহণ হয়

৩। চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবী সম্বন্ধে পাঁচটি ক'রে বাক্য রচনা কর।

যা করতে হবে:

১। তোমার মা ও ভাই-বোনদের সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ কেন হয় বুঝিয়ে বলো।

২। সংবাদপত্র, বিজ্ঞানের বই বা মাসিক পত্রিকা থেকে জোয়ার-ভাঁটা ও গ্রহণের ছবি সংগ্রহ করতে চেষ্টা কর।

বায়ু, জল ও আবহাওয়া



প্রায় সাড়ে তিনশো বছর আগে অটো ভোন নামে এক ব্যক্তি তাঁর একটা পরীক্ষা দেখিয়ে সমস্ত লোককে অবাক ক'রে দিয়েছিলেন। দুটো বড় বড় বাটির মত পাত্র মুখে মুখে বসিয়ে তার ভিতরকার বাতাসটি টেনে বের ক'রে নেওয়া হ'ল। আশ্চর্য ব্যাপার—দু'দিকে আটটা আটটা ক'রে ষোলটা ঘোড়াতেও টেনে সেই বাটির মুখ খুলতে পারেনি!

শক্তিমান ঘোড়াগুলি দু'দিক থেকে টেনেও কেন সেই বাটি দু'টির মুখ খুলতে পারল না? ঐ বাটি দু'টিকে কিসে চেপে রেখেছিল? বাটি দু'টির মধ্যে কি কোন বাতাস ছিল? ওটার কি হ'য়েছিল তুমি মনে কর? বাইরের বাতাস বাটি দু'টিকে দৃঢ়ভাবে চেপে রেখেছিল কি?

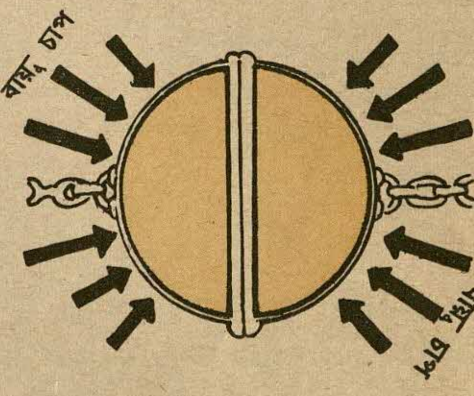
এস আমরা তা' দেখি—



একটা কাচের বড় গেলাস বা একটা বীকার নাও। ওর মধ্যে রঙিন জল ঢালো। ওর মধ্যে একটা পরিষ্কার কাচের ছিদ্রযুক্ত নল রাখো। নলটির ভিতরের এবং বাইরের জলের লেভেল দেখো। দুটোই কি এক লেভেলে আছে?

নলটি দিয়ে জল চুষে নাও। নলের মধ্যে জল উঠছে কি? কেন উঠছে বলতে পার?

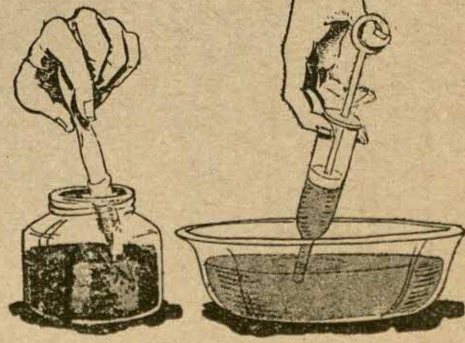
নলের ভিতরের বাতাসটাকে যখন তুমি চুষবার সময় টানছিলে তখন একটা কিছু জলটাকে নলের উপরের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল।



তোমরা জানো, বাতাস সব জায়গাতেই আছে। গেলাসের ভিতরের বাতাসটা সব সময় ঐ গেলাসের জলের উপর চাপ দেয়। নলের ভিতর দিয়ে যখন বাতাসটাকে টেনে নেওয়া হ'ল, তখন নলের ভিতর চাপটা খুব কমই হ'ল। এইজন্য গেলাসের জল নলের ভিতর দিয়ে উপরে উঠে এল। তাই আমরা বলি, বাতাসের চাপ আছে।

অটো ভোনের ঐ বাটি দুটির ভিতরকার বাতাস যখন বের করে নেওয়া হ'ল তখন ব্যাপারটা কি দাঁড়াল? বাটি দুটির বাইরের বাতাসের চাপ ও দুটিকে খুব শক্ত করে চেপে ধরল।

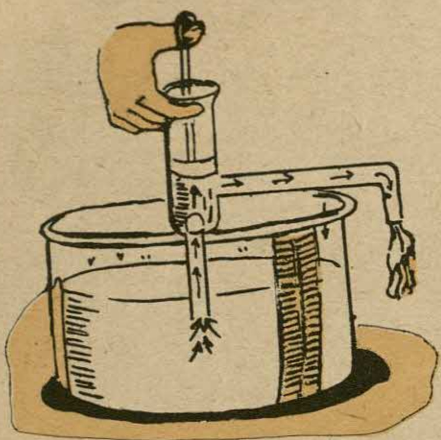
আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বাতাসের চাপ আর কোথায় কোথায় প্রয়োজন হয়?



এস আমরা তা' দেখি—

একটা পিচকারী নাও। একটা পাত্রে রঙিন জল রাখো। রং খেলবার সময় তোমরা যেভাবে পিচকারীতে রঙিন জল টেনে নাও, সেইভাবে ঐ পিচকারীর

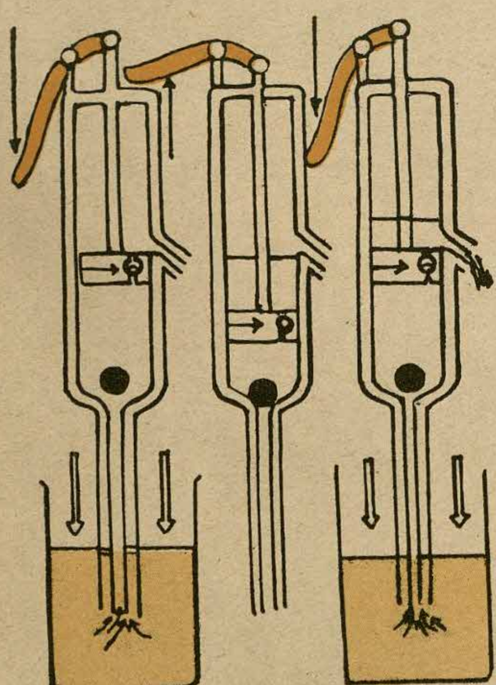
একটা মুখ জলের মধ্যে দাও। পিচকারীর পিষ্টনটায় উপর থেকে চাপ দাও। জলের মধ্যে বুদ্বুদগুলি কোথা থেকে এল? এবার হাতলটি উপর দিকে টানো—রং-জলটা উঠে আসবে পিচকারীর মধ্যে। কেন আসবে বল তো?



ঐ পিচকারীর মতই যে কোন টিউবকলের পাম্প কাজ করে। কেমন ক'রে ওগুলি একই রকম ব্যাপার তা' বলতে পার?

এস আমরা তা' দেখি—

জল-তোলা পাম্পের মডেলটি ভালো ক'রে লক্ষ্য কর। ভালভ্‌গুলি দেখো। পিষ্টনটা যদি উপর দিকে তোলা হয়, তাহ'লে ভালভের অবস্থা কি হবে? ওটা নীচের দিকে নামালেই বা কি হবে? এই দু'রকম অবস্থায় ভালভ্‌ একবার খোলে আর একবার বন্ধ হয় কেন?



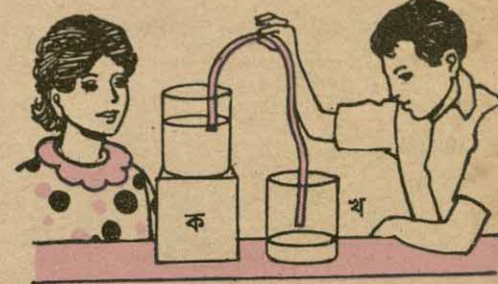
পাম্পের নীচের অংশটা জলের মধ্যে দাও। তারপর হাতলটা একবার উপর দিকে আর একবার নীচের দিকে ঠেলা দাও। পাম্পে জলের গতিটা লক্ষ্য কর।

ঠিক একইভাবে পিষ্টনটাকে—অর্থাৎ চোঙের মাঝখান দিয়ে যেটা ওঠা-নামা করে সেটাকে, তলার দিকে চাপ দিলে বাতাস গিয়ে জলে চাপ দেয়, তার ফলে উপর দিকে দ্বিতীয়বার টান দিলে জল উঠে আসে পাম্পের চোঙের ভিতর দিয়ে।

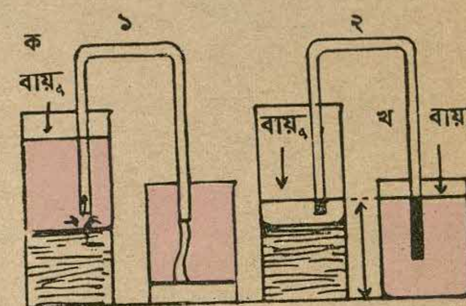
একটা ড্রাম থেকে আর একটা ড্রামে কি করে পেট্রোল বা কেরোসিন ঢালে দেখেছ কি? অনেক রকমেই ওটা ঢালা যেতে পারে, তবে সাইফন বা বক্রনালী যন্ত্র দিয়ে করাই সবচেয়ে সুবিধা। সাইফন কিভাবে কাজ করে?

এস আমরা তা' দেখি—

খানিকটা স্বচ্ছ প্ল্যাসটিকের নল নাও। একটা কাচের জার ক জলে পূর্ণ কর। পাত্রটা একটা ইট কি পাথরের উপর উঁচুতে রাখো। এর নীচেয় রাখো আর একটা খালি জার খ। প্ল্যাসটিকের নলটা জলে পূর্ণ করো। ওর দু' মুখ আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধরো। তারপর একটা মুখ ক জারে এবং আর একটা মুখ শূন্য জার খ-তে রাখো। তোমার আঙ্গুল ছেড়ে দাও নলের দু' মুখ থেকেই। কি হ'চ্ছে? ক জার থেকে খ জারে জল বেরিয়ে আসছে কেন?



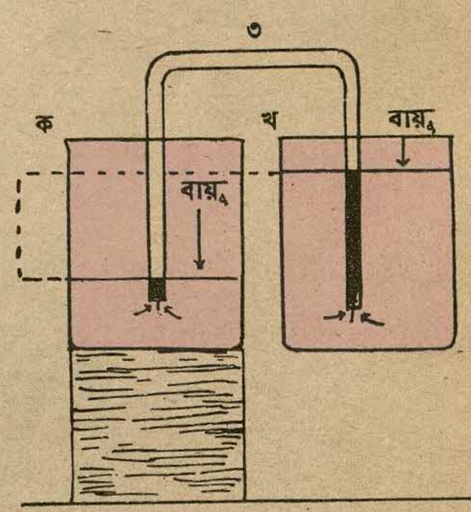
একটা মতলব বের কর যা'তে সাইফনের জল বা তেলের গতিটা আরও দ্রুত হয়। পরীক্ষা ক'রে দেখ, তোমার আন্দাজটা ঠিক হ'ল কিনা।



সাইফনে কাজ হয় কি ক'রে?

ক চিহ্নিত জারটি জলে পূর্ণ ক'রে ওর জল খ চিহ্নিত জারে আগের মতো চালিয়ে দাও। জলের গতি যখন থেমে যাবে তখন ক ও খ জারের জলের লেভেল কি দেখবে? ও দু'টি কি আলাদা?

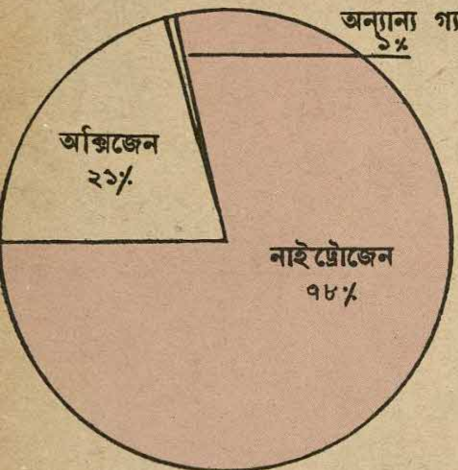
এবার খ জারটিকে ক জার যেখানে আছে তার থেকে উঁচু জায়গার রাখো। এবারও কি ক জার থেকে খ জারে জল ঢুকছে? কেন ওটা ঢুকছে না? তা'হলে সাইফন দিয়ে কাজ করাতে হ'লে সবচেয়ে বড় কথা কি হবে? ছবিতে তুমি বুঝতে পারবে সাইফন কিভাবে কাজ করে।



সাইফন দিয়ে অনেক রকমে কাজ করা হয়। মাঝে মাঝে নদী-নালা থেকে জল নিয়ে চাষের জমিতে দেওয়া হয়।

বাতাসের চাপ অনেক রকমে আমাদের কাজে আসে। এই চাপ দিয়ে আমরা বেলুন ফুলাই, ফুটবলের ব্লাডার ফুলাই, গাড়ীর টায়ারে বাতাস ভ'রে গাড়ী চালাই। পাম্প যন্ত্রেও কাজ হয় বাতাসের চাপ দিয়ে।

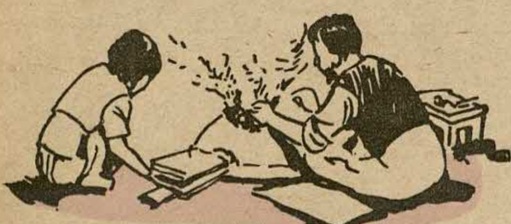
বেঁচে থাকবার জন্য বাতাস দরকার; কারণ বাতাসে অক্সিজেন আছে। অক্সিজেন ছাড়াও বাতাসে আছে নাইট্রোজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং জলীয় বাষ্প। ছবিতে বায়ুমণ্ডলে কোন্ গ্যাস কতখানি আছে তা দেখানো হ'য়েছে।



বাতাসে যত রকম গ্যাস আছে, তার মধ্যে অক্সিজেনই সবচেয়ে দরকারী। তোমরা স্বর্ণকারদের কাঠ-কয়লার হাপরে কেমন সুন্দর আগুন জ্বলে দেখেছ নিশ্চয়ই। বাড়ীতেও উনুনে পাখা দিয়ে বাতাস করতে হয়। হাপর বা পাখার বাতাসে আগুনটা বেশ উজ্জ্বল হ'য়ে জ্বলে ওঠে কেন? বাতাসের মধ্যে কি এমন কিছু আছে, যা' আগুন জ্বালাতে দরকার হয়?

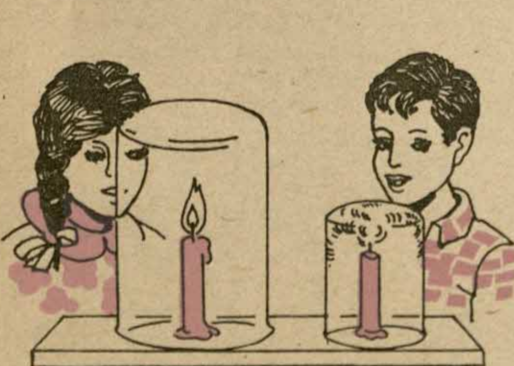
এস আমরা তা' দেখি—

একটা ছোট মোমবাতি জ্বেলে টেবিলের উপর রাখো। একটা কাচের বড় জার ঐ মোমবাতির উপর উপুড় করে বসিয়ে দাও। কিভাবে মোমবাতিটা জ্বলছে দেখো। ওটা কতক্ষণ জ্বলবে। নিবে যাওয়ার আগে মোমবাতির শিখাটার কি হবে?



মোমবাতিটা আবার জ্বালো। এবার একটা ছোট আকারের খালি জার ওর উপর উবুড় করে বসাও। মোমবাতিটা ওর মধ্যে কতক্ষণ জ্বলবে? আগের চাইতে এটা আরও কম সময় জ্বলবে কেন?

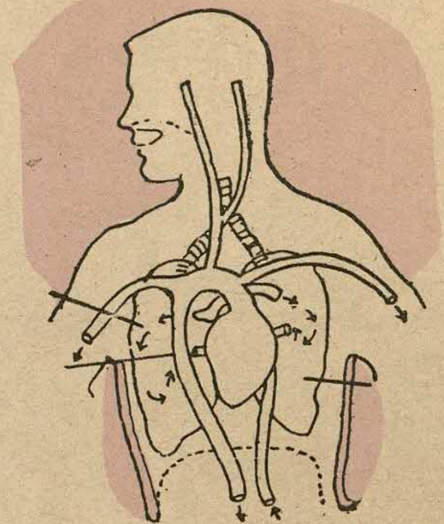
কোন জারটায় বেশী বাতাস ছিল? কোন জারটায় বাতিটা বেশীক্ষণ জ্বলেছে? এর থেকে দেখা যাচ্ছে, বেশী বাতাস যেখানে পেয়েছে, সেখানেই মোমবাতিটা বেশীক্ষণ জ্বলেছে। অতএব আগুন জ্বালানোয় বাতাসের দরকার।



বাতাসের অক্সিজেন অংশটাই আগুন জ্বালতে লাগে। তোমরা কাঠ বা কাঠ-কয়লা জ্বালাও। এগুলি জ্বালতে অক্সিজেন চাই। জ্বলন্ত আগুন থেকে আমরা উত্তাপ শক্তি পাই।

প্রশ্বাস নিতেও আমাদের অক্সিজেন লাগে। মানুষ এবং পশুপাখীরা যখন শ্বাস টেনে নেয়, তখন অক্সিজেন নিয়ে হৃদপিণ্ডের রক্ত সমস্ত দেহে ওটা ছড়িয়ে দেয়। তাতে করে খাদ্যটা জ্বালানো হয় এবং তার থেকে আমরা কাজ করবার শক্তি পাই।

যে নিঃশ্বাসটা আমরা ছাড়ি, তাতে অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকে। নির্গত নিঃশ্বাসে অক্সিজেনের জায়গায় আর কিছু থাকে কি?



এস আমরা তা' দেখি—

টাট্‌কা তৈরী কিছুটা চুণের জল নাও। দু'টি টেষ্ট টিউবের মধ্যে ওটা ঢেলে দাও। প্রথম টেষ্ট টিউবটা ভালো ক'রে ঝাঁকাও। চুণের জলে কোন পরিবর্তন হ'য়েছে কিনা দেখো।

এবার একটি নল-কাঠি নাও। নলটি দিয়ে দ্বিতীয় টিউবটায় আস্তে আস্তে নাক দিয়ে নিঃশ্বাস ছাড়ো। চুণ জলটার রং পাল্টাবে কি? এখন ওটার কোন্ রং হ'লো?

চুণ-জলের একটা বিশেষ ধর্ম আছে। সেটা এই যে, যখন এর ভিতর দিয়ে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস যায় তখন ওটা দুধের মত সাদা হ'য়ে পড়ে।



টেস্‌ট্‌ টিউব দুটির কোন্‌টিতে বেশী কার্বন-ডাই-অক্সাইড ঢুকেছে বল তো? যেটার মধ্যে নলের সাহায্যে নিঃশ্বাস ছাড়া হ'ল সেইটায় না অন্যটায়? মনে রাখবে, প্রথম টেস্‌ট্‌ টিউবে নিঃশ্বাস টেনে নিলে যে বাতাস থাকে তাই-ই আছে।

সমস্ত প্রাণী এবং গাছপালা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেয়। শ্বাস নেওয়ার সময় যে বাতাস নেওয়া হ'ল তার ভিতরকার অক্সিজেনটা দেহে প্রবেশ করে খাদ্যকে জ্বালায়, তার ফলে আমরা দেহে শক্তি পাই। নিঃশ্বাস ছাড়বার সময় কার্বন-ডাই-অক্সাইডটা বের করে দেওয়া হয়। এই অক্সিজেনকে গ্রহণ আর কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে পরিত্যাগ—একেই শ্বাসক্রিয়া বলে।

এইভাবে সমস্ত গাছপালা ও প্রাণীরা সব সময় শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়।



যদিও আমরা সব সময় অক্সিজেন গ্রহণ করছি, তবুও কিন্তু এর পরিমাণ কমে না বাতাস থেকে। একই থাকে। কেমন ক'রে ওটা পূরণ হয়?

এস আমরা তা' দেখি—

জলের নীচে জন্মায় এমন সবুজ পাতাযুক্ত কয়েকটি গাছের ডাল নাও। এক পাত্র জলের মধ্যে ওগুলি দিয়ে রৌদ্রে রাখো। ঘণ্টাখানেক পরে ওটা দেখো। পাতার উপর ছোট ছোট বুদ্বুদের মত ওগুলি কি?





প্রমাণ করা যায় সবুজ পাতার উপর ঐ ছোট ছোট বুদ্বুদগুলি অক্সিজেনের তৈরী। সবুজ পাতাগুলি জলের মধ্যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ব্যবহার করে। সূর্য-কিরণ থাকায় তাতে তাদের খাদ্য তৈরী হয়। এর ফলে শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ায় যে অক্সিজেন খরচ হয় তার পূরণ হ'য়ে যায়।

জল

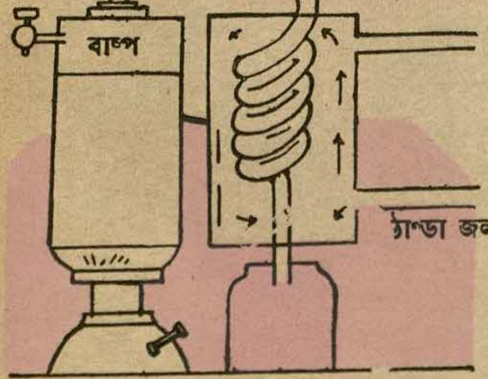
আমরা জানি, অনেক জিনিষ জলে গুলে গিয়ে দ্রবণ তৈরী হয়। এই দ্রবণকে আবার কোন উপায়ে ঐ জিনিষে ফিরিয়ে আনা যায় কি?



এস আমরা তা' দেখি—

সাধারণ লবণ ও জল দিয়ে একটা দ্রবণ তৈরী কর। টেষ্ট টিউব বা কোন ধাতুর চামচেয় ওটার থেকে কয়েক ফোঁটা নুন-গোলা জল গরম কর। জলটার কি হবে? চামচেয় কি পড়ে থাকবে? ওটা কি গোড়ার সেই লবণের মত দেখতে? ঐ দ্রবণ থেকে আসল নুনটা কি ক'রে পৃথক হ'ল? যখন কোন দ্রবণকে উত্তপ্ত করা যায়, তখন জলটা বাষ্পাকারে উড়ে যায় এবং গলিত জিনিষটা পড়ে থাকে।

গলিত বস্তুকে তা হ'লে জল থেকে পৃথক করা যায়। জলটাকে সেজন্য বাষ্প ক'রে সরিয়ে দিতে হবে।



জলটাকে বাষ্প ক'রে দিয়ে ঐ গলিত পদার্থ লবণটা না হয় ফিরে পাওয়া গেল, কিন্তু জলটাকে ত' আর ফিরে পাওয়া গেল না? কেমন ক'রে ঐ জলটাকেও আমরা ফিরে পেতে পারি?

আমরা জানি, কোনও তরল পদার্থের বাষ্পকে ঠাণ্ডা করলে ওটা ঘনীভূত হয়। তা হ'লে ঐ জলকে ফিরে পেতে হ'লে বাষ্পটাকে ঠাণ্ডা ক'রে নিতে হবে। এই প্রক্রিয়াকে 'পরিস্রুত করণ' বা ডিসটিলেসন বলে। কি ক'রে একটা তরল পদার্থকে পরিস্রুত করে ছবিতে তা' দেখতে পাবে।

জল খুব ভালো দ্রাবক। প্রাকৃতিক জলের অধিকাংশতেই অনেক দ্রবীভূত পদার্থ থাকে। আবার গ'লে যায় না এমন পদার্থ এবং জীবাণুও জলের মধ্যে থাকতে পারে। জল থেকে আমরা কি ক'রে যা' গলে না এমন পদার্থ দূরীভূত করতে পারি?



এস আমরা তা' দেখি—

কোনও পুকুর বা নদী থেকে এক বালতি কাদা-জল নাও। কিছুক্ষণের জন্য বালতিটাকে নাড়াচাড়া না ক'রে স্থিরভাবে রেখে দাও। বালতির তলায় কি প'ড়ছে দেখতে পাবে?

দ্রবণীয় নয় এমন ভারী ও বড় বড় কণাগুলি কোথায় গিয়ে থিতিয়ে পড়ল? ওগুলিকে তুমি কি ক'রে জল থেকে পৃথক করতে পার? বালতিটা আস্তে আস্তে কাত ক'রে ওর উপরের পরিষ্কার জলটা একটা কাচের গেলাসে ঢেলে নাও। এই প্রক্রিয়াকে 'ডিক্যানটেসন' বা আস্রাবণ প্রক্রিয়া বলা হয়। বড় ও ভারী গুঁড়ো পদার্থগুলি—যা বালতির তলায় থিতিয়ে থাকে, এই পদ্ধতিতে একমাত্র তার থেকেই জলটাকে পৃথক করা যায়।

কাচের গেলাসের ঐ জলটার মধ্যে কিন্তু এখনও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গুঁড়ো আছে যা গলে না। এই গুঁড়োগুলি এত ক্ষুদ্র এবং হাল্কা যে ওগুলি এক জায়গায় থিতায় না। জলের ভিতর থেকে এই গুঁড়োগুলি কি ক'রে সরানো যায়?

এস আমরা তা' দেখি—



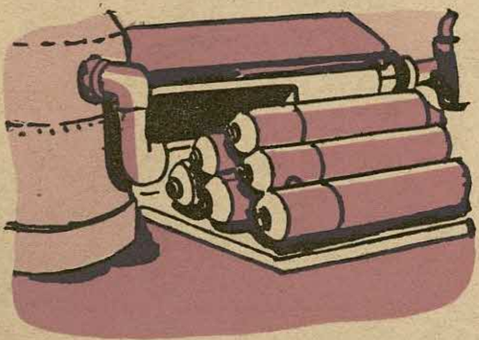
ছবিতে যেমন দেখানো হ'য়েছে, একটা ফানেল ও একটা বীকার নাও। তারপর একটা ফিলটার কাগজ ফানেলের মুখে রাখো। এবার ঐ কাচের গেলাসের জলটা ফিলটার কাগজের উপর দিয়ে বীকারে ঢেলে দাও।

ফিলটার কাগজে কি লেগে আছে দেখতে পাবে? ফানেলের নীচে বীকারের জলটায় কি দেখতে পাবে?

ফিলটার করা পরিষ্কার জলেও জীবাণু থাকতে পারে। সেগুলিকে দেখা যায় না। একমাত্র মাইক্রোসকোপ বা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেই সেগুলিকে দেখা যায়। এই জীবাণুগুলি অনেক রোগের কারণ হতে পারে। ঐ রকমের পরিষ্কার জলটা জ্বাল দিয়ে নেওয়া উচিত। জ্বাল দিয়ে ফুটিয়ে নিলে জীবাণুগুলি মরে যায়। তখন ওটা পান করা নিরাপদ।

এইসব জীবাণুর কোন কোনগুলি জলটাকে ফিলটার করলেই চলে যায়। অবশিষ্ট জীবাণুগুলিকে আমরা কোন্ কোন্ উপায়ে দূর করতে পারি?

কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ জলে দিয়েও জীবাণুগুলিকে মেরে ফেলা যায়।



পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট সেই রকম একটি রাসায়নিক পদার্থ। ক্লোরিন সংযোগেও জীবাণু মারা যায়। অনেক শহরে যাঁরা কলের জল সরবরাহ করেন, তাঁরা জলের সঙ্গে কখন কখনও ক্লোরিন মিশিয়ে দেন। রাসায়নিক দ্রব্য সংযোগে জীবাণু মেরে ফেলাই সহজসাধ্য; কিন্তু এতে জলের আস্বাদটা খারাপ হ'য়ে যায়। এই বিস্বাদটা আসে কোথা থেকে?

জীবাণুশূন্য পানীয় জলটা যত্নের সঙ্গে রেখে দেওয়া উচিত। জল রাখবার পাত্রটি হবে পরিষ্কার এবং ওটা একটা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা দরকার। যে গেলাসে জল খেতে হবে সেটাও রাখতে হবে পরিষ্কার এবং জীবাণুশূন্য।

আমরা কি শিখলাম?

১। বাতাস চাপ দেয়।

২। বাতাসের চাপ সাহায্যে তরল পদার্থ টেনে নেওয়া যায়, যেমন নলের সাহায্যে আমরা খেজুর রস টেনে খাই, নলকূপ থেকে জল তুলি। পিচকারী আর সাইফনেও বাতাসের চাপে কাজ হয়।

৩। বাতাসে অনেক দরকারী গ্যাস থাকে। শ্বাস গ্রহণের সময় আমরা অক্সিজেন নিই আর ফোটোসিনথেসিসে (সালোকসংশ্লেষ) ব্যবহৃত হয় কার্বন-ডাই-অক্সাইড।

৪। বাষ্পীভবন এবং পাতন পদ্ধতির দ্বারা জলে দ্রবীভূত পদার্থকে পৃথক করা যায়।

৫। থিতিয়ে নিয়ে বা ফিলটার ক'রে যেসব জিনিষ জলে গলে যায় না, তা সরিয়ে ফেলা যায়।

৬। কোনও জল পরিষ্কার হ'লেই যে তা পানীয় হবে তা নয়। ওর মধ্যে জীবাণু থাকতে পারে।

৭। জলটা ফুটিয়ে নিয়ে বা রাসায়নিক সংযোগে জীবাণুগুলিকে ধ্বংস করা যায়।

এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হবে—

১। উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থানগুলি পূর্ণ কর—

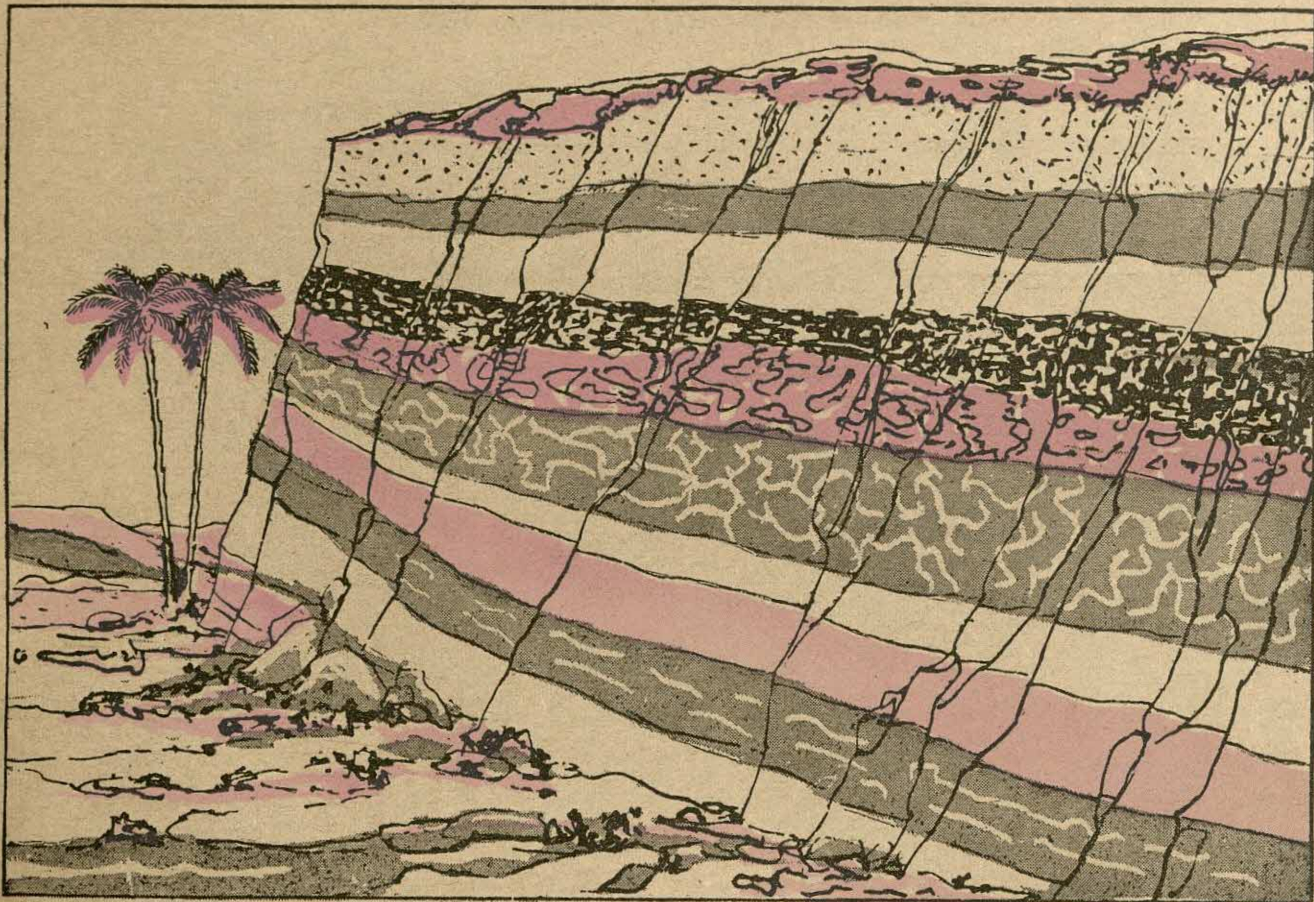
(ক) বাতাসে......আছে ব'লেই জ্বালানী আগুনে জ্বলে। (নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড)

(খ) বাতাসে যে......আছে, ওটা ফোটোসিনথেসিস-এ ব্যবহৃত হয়। (নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড)

(গ) জলে জীবাণু থাকতে পারে। তার অধিকাংশই......দিয়ে ধ্বংস করা যায়। (আস্রাবণ, পরিস্রাবণ, জ্বাল)

(ঘ) দ্রবীভূত পদার্থগুলিকে জল থেকে.........দ্বারা সরিয়ে নেওয়া যায়। (আস্রাবণ, পরিস্রাবণ, পাতন)

২। দুধ খাওয়ার আগে ওটা বেশ করে ফুটিয়ে নেওয়া উচিত কেন?



বিভিন্ন রকমের শিলা গড়ে উঠতে পারে। এই পৃষ্ঠার উপরের ছবিখানি দেখো। শিলার স্তরগুলি দেখতে পাচ্ছ কি? অনেকগুলি স্তর দিয়ে যে শিলা তৈরী হয় তাকে পাললিক শিলা বলে।

এই সব শিলায় স্তরগুলি কি কারণে তৈরী হয়?



এস আমরা তা' দেখি—

একটা কাচের জারের অর্ধেকটা জল দিয়ে পূর্ণ কর। ওর মধ্যে কিছু বালি, কাঁকর আর মাটি মিশাও। জলটা ভালোভাবে নেড়ে দাও। তারপর ঐ জারটা টেবিলের উপর রেখে দাও, কোনরকম নাড়াচাড়া ক'রো না। পরদিন ঐ জারটা দেখো। কি দেখবে?

জারের মধ্যে বালি, মাটি প্রভৃতি যা ছিল, তা' জারের তলায় বিভিন্ন স্তরে থিতিয়ে প'ড়েছে। সবচেয়ে বড় জিনিষগুলি কোথায় দেখতে পাবে? সবচেয়ে ছোট আর হাল্কাগুলি? এইসব জিনিষ যা থিতিয়ে পড়ে তাকে তলানী বলে।

তলানীগুলি স্তরে স্তরে কেন থিতায়?



যখন তুমি নদীতে স্নান করবে তখন দু'হাতের পাতা একসঙ্গে ক'রে স্রোতের তলায় ধর। তারপর কিছু সময় পরে জল থেকে তোলো। তোমার হাতের মধ্যে কি দেখতে পাবে? জল ছাড়া তোমার হাতে আর কি পাবে? ঠিক ঐ রকমে নদীর তলায় তলানী পড়ে। তোমার কাচের জারের মধ্যে দেখেছ, ভারী জিনিষ গুলি সকলের আগে থিতিয়ে পড়ে। হাল্কাগুলি থিতাতে সময় লাগে। এইভাবে তলানীগুলি স্তরে স্তরে জমা হয়।

এই তলানীগুলি সর্বদা একটার উপর আর একটা জমা হয়। উপরের স্তরের ওজনটা নীচের স্তরের উপর চাপ দেয়। এইভাবে তলানীগুলি পাললিক শিলায় পরিণত হয়।

স্তরে স্তরে তৈরী নয় এমন কোন শিলা আছে কি?

এস আমরা তা' দেখি—

একখানা গ্রেনাইট (granite) পাথর পরীক্ষা করে দেখো। ওর মধ্যে কি স্তর দেখতে পাচ্ছ? একটা টুকরো ভেঙ্গে গুঁড়ো করো। মোটা গুঁড়োগুলিকে একটা আতস কাচ (ম্যাগনিফাইং গ্লাস) দিয়ে পরীক্ষা কর। কত রকমের গুঁড়ো দেখতে পাচ্ছ?



কতকগুলো গুঁড়োর কণা কাচের মত দেখতে। এগুলি কোয়ার্টজ বা শিলাস্ফটিকের গুঁড়ো। আর কতকগুলি সাদা বা বাদামী রংয়ের। এগুলি ফেল্ডস্পার। এই পাথরের কোন কোন গুঁড়োর কণা উজ্জ্বল দীপ্তি দেয়। এগুলি অভ্র বা মাইকা। গুঁড়োর ঐ সব কণা অনেক বিভিন্ন রকমের। তথাপি সেগুলি বিভিন্ন স্তর সৃষ্টি করে না।

গ্রেনাইটকে আগ্নেয় শিলার উদাহরণ স্বরূপ ধরা যায়। আগ্নেয় শিলায় স্তর থাকে না কেন? দেখ তো, তুমি কিছু অনুমান করতে পার কিনা। সম্ভবতঃ পাললিক শিলা যেভাবে তৈরী হয়, এটা সেভাবে হয় না, অন্যভাবে হয়।



পৃথিবীর মাটির চাংড়ার নরম জায়গায় আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত হয়। পাহাড়ের উত্তপ্ত গলিত পদার্থ মাটির নীচে থেকে ঐসব মুখবিবর দিয়ে বেরিয়ে আসে। এইসব গলিত পাহাড় ঠাণ্ডা হ'লে কি হয়? আগ্নেয় শিলা তৈরী হয় পাহাড়ের এই গলিত পদার্থগুলি দিয়ে।

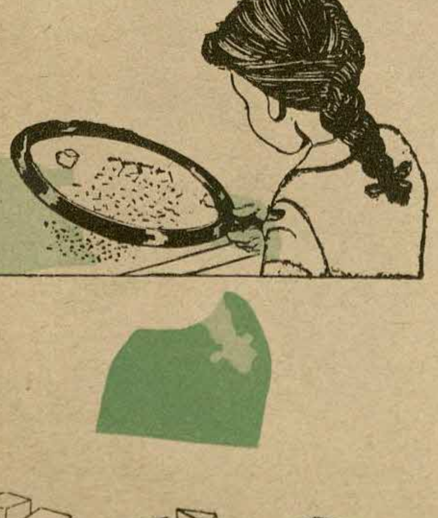
কতকগুলি শিলাকে পরিবর্তনশীল বা মেটামরফিক শিলা বলে। গোড়ায় এই সকল শিলা কিন্তু আগ্নেয় বা পাললিক শিলা ছিল। যাই হোক্, মাটির নীচের উত্তাপ ও চাপের ফলে ওগুলির পরিবর্তন হয়। 'মেটামরফোসিস্' কথাটির অর্থ পরিবর্তন। এজন্য মেটামরফোসিস্ শিলা বলতে বুঝতে হবে পরিবর্তিত শিলা।



শিলাগুলি ঠিক একটা বস্তু নয়। সেগুলি বিভিন্ন খনিজ পদার্থ দিয়ে তৈরী। যেমন ধর, যে তিনটি খনিজ পদার্থ গ্রেনাইটে পাওয়া যায় তাকে বলা হয় 'কোয়ার্টজ', ফেল্ডস্পার ও মাইকা। খনিজ পদার্থগুলি মাটির মধ্যে পাওয়া যায়। স্ফটিকের মত যে খনিজ পদার্থ পাওয়া যায় তাই দিয়ে তৈরী হয় শিলা। কিন্তু স্ফটিক কিসের মত?

এস আমরা তা' দেখি—

সাধারণ লবণ থেকে কয়েকটি স্বচ্ছ দানা বেছে নাও। একখানা আতস কাচ দিয়ে সেগুলি দেখো। তাদের আকারটা কি রকম, একখানা কাগজের উপর তা এঁকে রাখো। ঐ টুকরোগুলি কি একটা আর একটার মত দেখতে?



অনেক রকমের স্বচ্ছ দানা ছোট বড় বিভিন্ন আকারের হ'তে পারে, কিন্তু তাদের গঠনটা একই রকম।

চিনি, তুঁতে বা কপার সালফেট, ফিটকিরি ও মার্বেল প্রভৃতির কতকগুলি দানা নিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখো।

ওর ভিতর থেকে বড় একটা দানা নিয়ে গুঁড়ো করো। এই গুঁড়ো-করা স্বচ্ছ দানার ছোট কণাগুলির গঠন কেমন তা দেখো। ওগুলি কি আসলটার মতো?



প্রত্যেক বস্তুর দানার একটা নির্দিষ্ট গঠন আছে। লবণের গঠন ত্রিকোণাকার (cubic)। অনেক খনিজ পদার্থ দানারূপে শিলাতে থাকে। একটা হাত-লেন্স্ দিয়ে ওগুলির গঠন দেখলে চেনা যায়।

যে আগ্নেয় শিলা প্রচুর দেখা যায় গ্রেনাইট তার মধ্যে একটি। গ্রেনাইটের মধ্যে কোয়ার্টজ খনিজ পদার্থ যথেষ্ট পাওয়া যায়। রেডিও এবং ইলেকট্রোনিক শিল্পের জন্য কোয়ার্টজ খুব দরকারী। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি তৈরী করতে মাইকা (অভ্র) খুব প্রয়োজন।

কোয়ার্টজ ও মাইকা ছাড়াও আরও অনেক খনিজ দ্রব্য আছে যা' আমাদের দেশে সচরাচর পাওয়া যায়। এর কতকগুলি খনিজ দ্রব্য ওগুলির মধ্যে যে ধাতু আছে তা' তুলতে ব্যবহৃত হয়। এরূপ খনিজ দ্রব্যকে আকর থেকে তোলা মাটি মেশানো ধাতুপিণ্ড বলে। লোহার আকর থেকে আমরা পাই লোহা। সেই লোহা থেকে তৈরী হয় ইস্পাত। সমস্ত ধাতুর মধ্যে লোহা সবচেয়ে দরকারী।

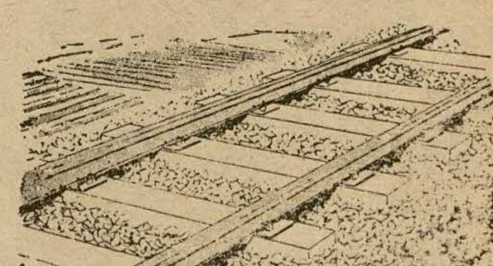


একমাত্র খনিজ দ্রব্যের জন্যই যে শিলা প্রয়োজনীয় তা' নয়। তার থেকে আরও অনেক কাজ হয়। শিলা বিভিন্নভাবে কি কি কাজে লাগে?

এস আমরা তা' দেখি—

পাথর দিয়ে তৈরী দেওয়াল—এমন একটি ঘরের কাছে যাও। ঐ দেওয়াল পাথর কেটে কিভাবে তৈরী হ'য়েছে তা দেখো।

পাথরকে ইটের মতো ক'রে কেটে দেওয়াল করা হয়। চ্যাপ্টা পাথরের চাংড়াকে টালীর মত ক'রে ছাদ আর মেঝে করা হয়। ছোট পাথরের নুড়ি দিয়ে অন্যান্য কারুকার্য করা চলে।

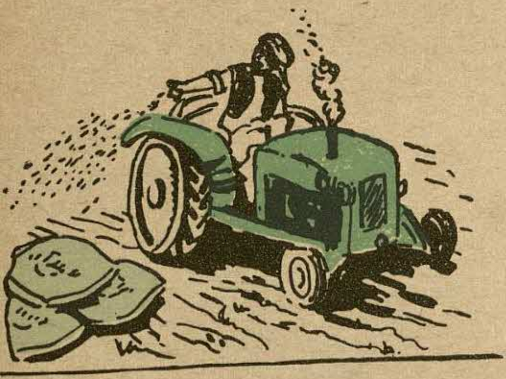


রেলপথের লাইনে তুমি পাথরের কুচি (ব্যালাষ্ট) দেখেছ কি? রেলপথটা (ট্র্যাক) এই পাথরের কুচির উপর থাকে। রাস্তা শক্ত করবার জন্যও পাথর ব্যবহৃত হয়।

গাছপালার বৃদ্ধির জন্য খনিজ পদার্থ দরকার। যেসব খনিজ দ্রব্যে নাইট্রোজেন, ফসফরাস আর পটাসিয়াম আছে সেগুলি গাছপালার বৃদ্ধির জন্য খুবই প্রয়োজন। একটা চারাগাছ বাড়বার সময় মাটি থেকে এইসব খনিজ দ্রব্য গ্রহণ করে। একই ক্ষেতে বারবার ফসল জন্মালে ঐ ক্ষেতের এইসব খনিজ পদার্থ ফুরিয়ে যায়। কি করে মাটিতে এগুলি আবার ফিরিয়ে আনা যায়? জমিতে সার দিয়ে তা' করা হয়। ফসল জন্মাবার ফলে যে খনিজ দ্রব্য ফুরিয়ে যায়, সার দিলে তা জমিতে আবার ফিরে আসে।

সার হিসাবে কোন্ কোন্ খনিজ দ্রব্য ব্যবহৃত হয়?

এস আমরা তার খোঁজ করি—



এখানে যে তালিকাটি দেওয়া হ'য়েছে তা ভালো ক'রে লক্ষ্য কর। কোন্ সার জমিতে নাইট্রোজেন দেয়? কোন্‌টা ফসফরাস বা পটাসিয়াম দেয়? এই তিনটি অতি প্রয়োজনীয় খনিজ দ্রব্যের মধ্যে কোন্ সারে অন্ততঃ দুটি খনিজ দ্রব্য আছে?

যে খনিজ পদার্থ থেকে ধাতু পাওয়া যায়, তাকে ঐ ধাতুটার আকর বলা হয়। কোন কোন পাহাড়ে দরকারী খনিজ পদার্থের আকর থাকে। যেমন—সিংভূমের খনি অঞ্চলের পাহাড়ে লোহার আকর থাকে। রাজস্থানের ক্ষেত্রি অঞ্চলের খনিতে পাওয়া যায় তামার আকর।



পাথর থেকে আমরা খনিজ পদার্থ পাই। সল্টপিটার ও রক-ফসফেট প্রভৃতি খনিজ পদার্থ কৃষি উৎপাদনে প্রয়োজন হয়। গ্রেনাইট, মার্বেল প্রভৃতি বাড়ী ও প্রতিমূর্তি তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। কতকগুলি খনিজ পদার্থ খুবই দরকার, কারণ, তার থেকে আমরা ধাতু পেয়ে থাকি। যেমন—এ্যালুমিনিয়াম, তামা, রুপো ও সোনা।

এইসব খনিজ দ্রব্য আমাদের আধুনিক জীবনধারায় কিভাবে কাজে লাগে?

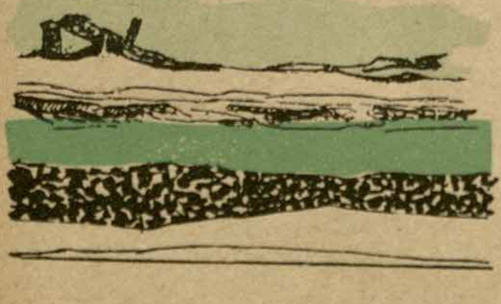
এস আমরা তা' দেখি—



পাশের ছবিটার দিকে তাকাও। এর মধ্যে কোন্ কোন্ জিনিষ অ্যালুমিনিয়ামে তৈরী বলো। কোন্‌গুলি লোহা ও ইস্পাতের? ওর মধ্যে কোন্ কোন্ জিনিষ তামা বা পিতলের তা' বের করো। সোনা খুব মূল্যবান ধাতু। সোনা দিয়ে কি কি তৈরী হয়?

মাটির নীচে থেকে আমরা অনেক প্রয়োজনীয় জিনিষ পাই। জল, খনিজ দ্রব্য, ধাতুর আকর প্রভৃতি তার অন্যতম। মাটির তলা থেকে আর আমরা কি পাই?

মাটির নীচে খনি থেকে আমরা কয়লা পাই। মাটির নীচে কয়লা কিভাবে হয়?

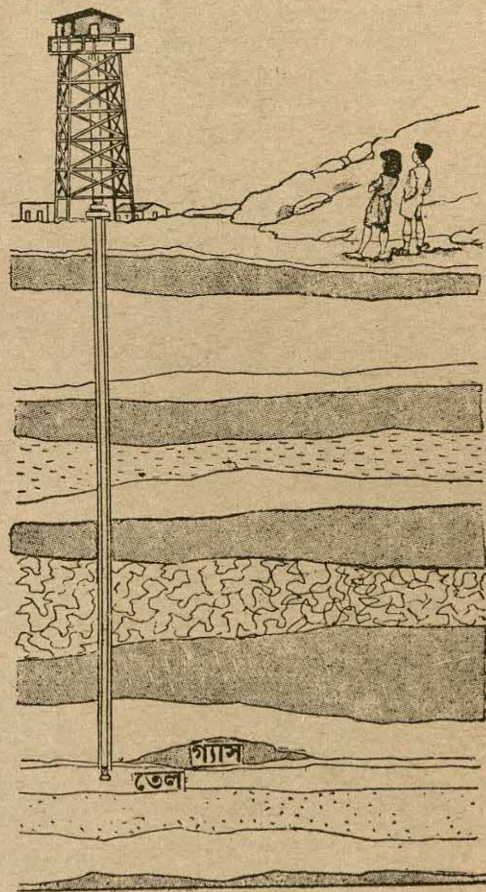


পাশের ছবিতে একটা গভীর, জলাভূমির অরণ্য দেখা যাচ্ছে। এরূপ অরণ্য এককালে পৃথিবীর অনেকখানি অংশ জুড়ে ছিল। সে প্রায় লক্ষ লক্ষ বছর আগের কথা। কালক্রমে ঐ সব অরণ্যের গাছপালা ম'রে গিয়ে কাদা আর বালির নীচে চাপা পড়ে। তারপর তার ওপর আবার নতুন অরণ্য দেখা দেয়। এগুলিও কালক্রমে ঐভাবে চাপা প'ড়ে যায়।

মাটির নীচে এইসব মরা গাছপালা ভীষণ উত্তাপ ও চাপ ভোগ করে। তার ফলে কয়েক লক্ষ বছর ধ'রে এইসব গাছপালা কয়লায় পরিণত হয়।

কয়লা ছাড়াও আর একটা প্রয়োজনীয় জ্বালানী পাওয়া যায় মাটির নীচে। এটা পেট্রোলিয়াম। পেট্রোলিয়াম থেকে আমরা কেরোসিন, পেট্রোল, ডিজেল তেল, ভের্জালিন ও প্যারাফিন প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ পাই।

মাটির তলা থেকে পেট্রোল কি ক'রে পাওয়া যায়?



এস আমরা তা' দেখি—

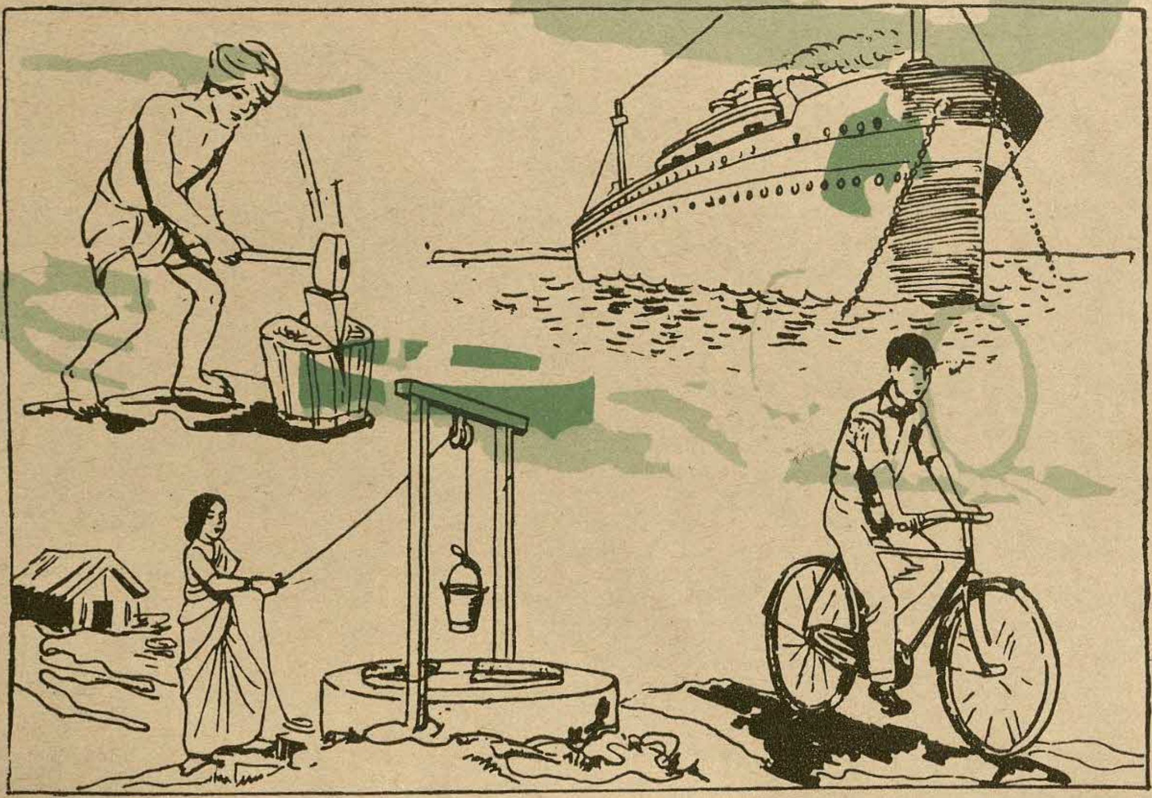
পাশের ছবিতে দেখা যাচ্ছে কি করে মাটি থেকে পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায়। লক্ষ্য কর, তেলটাকে জলের উপর একটা স্তররূপে দেখানো হ'য়েছে। তেলের স্তরের উপর র'য়েছে গ্যাস। এটাকে স্বাভাবিক গ্যাস বলা হয়।

আমরা কি শিখলাম?

১। শিলা তিন রকমের : পলি রচিত শিলা, আগ্নেয় শিলা ও পরিবর্তনশীল শিলা।
২। পলি রচিত বা পাললিক শিলা তলানী জমাট বেঁধে তৈরী হয়।
৩। মাটির নীচে থেকে শিলার গলিত পদার্থগুলি ঠান্ডা হয়ে আগ্নেয় শিলা তৈরী হয়।
৪। চাপ ও উত্তাপের ফলে কোন কোন শিলা পরিবর্তনশীল শিলায় পরিণত হয়।
৫। শিলায় খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। তার কোন কোনটি সাধারণ এবং মানুষের দরকারে লাগে।
৬। ধাতু আকর থেকে পাওয়া যায়।
৭। কয়লা ও পেট্রোলিয়াম মাটির নীচে থেকে পাওয়া যায়।

প্রশ্নগুলির উত্তর দাও—

(ক) অভ্র কি কাজে লাগে?
(খ) আমরা সোনা কিভাবে ব্যবহার করি?
(গ) কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে আমরা অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার করি?
(ঘ) কি কি কাজে তামা ব্যবহার করি?



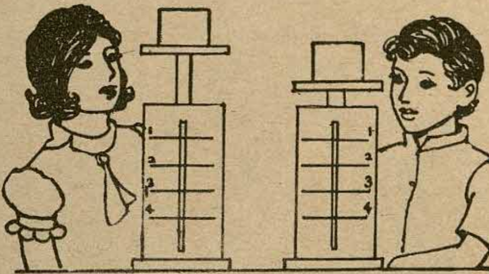
তোমরা কখনও এক কিলো কাঠের সঙ্গে এক কিলোগ্রাম ওজনের তুলনা ক'রে দেখেছ কি? আয়তন কোন্‌টার বেশি—কাঠটা না এক কিলোগ্রাম ওজনটা? যদিও দুটির ওজন একই, কিন্তু ওদের আয়তন আলাদা।

একই আকারের একটি লোহার ও আর একটি এ্যালুমিনিয়ামের ব্লক ওজন করলে দেখা যাবে, লোহার ব্লকটির ওজন এ্যালুমিনিয়ামের ব্লকের চেয়ে বেশি। কেন এমন হয়?

আমরা বলি, লোহা এ্যালুমিনিয়াম বা কাঠের চেয়ে বেশি ঘন। কিন্তু কি ক'রে আমরা জানব কোন্‌টা বেশি ঘন—এ্যালুমিনিয়াম না কাঠ?

এস আমরা তা' দেখি—

একটা এ্যাল্‌মিনিয়াম, একটা লোহা ও আর একটা কাঠের—একই আকারের তিন রকম ব্লক বা চৌকা নাও। প্রত্যেকটি ওজন ক'রে ওজনটা তোমার নোটবুকে লিখে রাখো। এবার ওর যে কোন একটি ব্লকের আয়তনের সমান জল ওজন করো। এইভাবে সবগুলিরই ওজন নাও। এবার ওজন সব চাইতে যেটার বেশি, সেটা একদিকে রাখো। যেটার সবচেয়ে কম সেটা রাখো আর একদিকে। দেখবে, এ্যাল্‌মিনিয়াম জলের চেয়ে ২·৭ গুণ ভারী। লোহা ভারী ৭·৮ গুণ। কাঠের ওজন জলের চেয়ে কম।

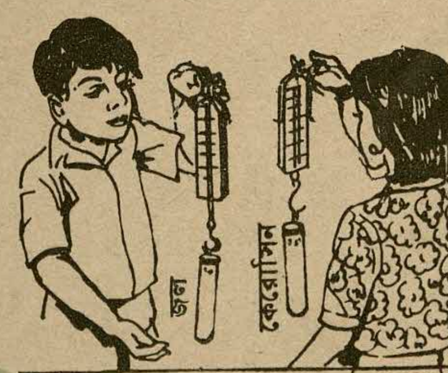


এইভাবে তোমরা তরল পদার্থের ওজনও তুলনা ক'রে দেখতে পারো।

কিভাবে আমরা তা' করব?

এস, দেখা যাক—

ঠিক একই রকমের তিনটি টেষ্ট্ টিউব নাও। ওগুলিতে ১, ২, ৩ নম্বর দিয়ে রাখো। টিউবগুলির ওজন নাও। তারপর একই আয়তনের জল, কেরোসিন এবং দুধ দিয়ে টিউবগুলি যথাক্রমে পূর্ণ করো। এবার সমস্ত তরল পদার্থ-গুলির ওজন বের করো।



এইভাবে এই ওজনগুলি লিখে রাখো—

জলের ওজন—	=	গ্রাম ওজন
কেরোসিনের ওজন—	=	গ্রাম ওজন
দুধের ওজন—	=	গ্রাম ওজন

কেরোসিন জলের চেয়ে কম না বেশি ঘন?
দুধ জলের চেয়ে কম না বেশি ঘন?

কোন বস্তুর ঘনত্ব জানতে হ'লে আমরা ঐ বস্তুর ওজনের সঙ্গে একই আয়তনের জলের ওজন তুলনা করে দেখতে পারি।

এই সিদ্ধান্ত থেকে বল দেখি, দুধ জল থেকে কত গুণ ভারী। এইভাবে কেরোসিন জল থেকে কত গুণ হাল্কা বলো। জলকে ঘনত্বের তুলনার মাপকাঠি হিসাবে ধরা হয়।

প্রত্যেক বস্তুরই একটা নির্দিষ্ট ঘনত্ব আছে এবং ঘনত্ব অনুসারেই আমরা প্রায় সব সময় কোনও বস্তুকে জানতে পারি।

নিম্নলিখিত তালিকায় (জলের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে) বিভিন্ন বস্তুর ঘনত্ব দেওয়া হ'য়েছে—

সোনা	১৯·৩
রূপো	১০·৫
পিতল	৮·৫
লোহা	৭·৮
এ্যালুমিনিয়াম	২·৭
জল	১·০
বরফ	০·৯
কেরোসিন	০·৮



আমরা জানি তরল পদার্থের ওজন আছে। যার ওজন আছে এমন যে কোনও জিনিষ চাপ দেয়। তরল পদার্থেরও চাপ আছে। কি ক'রে তা' জানা যায়?

এস আমরা তা' দেখি—

সম গোলাকার একটা টিনের চোঙ্গ নাও। ওর গায়ে চারটি ছিদ্র করো। তারপর ঐ ছিদ্রগুলি মোম বা ময়দা দিয়ে বন্ধ ক'রে দাও। এবার ঐ টিনটাকে একটা বালতির জলের মধ্যে ডুবাও। কি মনে হ'চ্ছে? টিনটাকে ডুবাতে গিয়ে একটা বাধা পাচ্ছ কি?



এর থেকে জানা যাচ্ছে, জল উপর দিকে চাপ দেয়। জলের মতো অন্যান্য তরল পদার্থও উপর দিকে চাপ দেয়। আচ্ছা, তরল পদার্থ কি নীচের দিকেও চাপ দেয়?

এস তা' দেখা যাক—

ঐ টিনটা জলে পূর্ণ কর। ঐ টিনের গায়ে যে ছিদ্রগুলি মোম দিয়ে বন্ধ করা ছিল, সেগুলি তুলে দাও। কি হয় দেখো। ছিদ্রগুলি দিয়ে জল বেরিয়ে আসছে। কোন্ ছিদ্রটি দিয়ে বেশি জোরে জল পড়ছে? সবচেয়ে নীচের ছিদ্রটি দিয়ে জোরে জল পড়ছে কেন? টিনটার জল নীচের দিকে চাপ দিচ্ছে ব'লেই ওটা হ'চ্ছে।

এর থেকে আমরা জানতে পারি, জল নীচের দিকে চাপ দেয়। গভীরতা অনুসারে এই চাপ বাড়ে। জলের মতো অন্যান্য তরল পদার্থও নীচের দিকে চাপ দেয়। একই গভীরতায় চারদিকের চাপ কি সমান হয়?

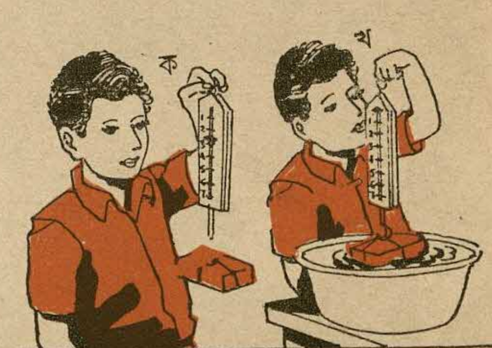
এস আমরা তা' দেখি—

এর আগে যে টিনটা ব্যবহার করা হ'য়েছিল সেটা নাও। ওর সবগুলি ছিদ্র বন্ধ ক'রে দাও। টিনটির মাঝামাঝি জায়গার চারদিকে নতুন ছিদ্র করো। এবার টিনটিকে এক বালতী জলের মধ্যে চেপে ধরো। দেখো, কিভাবে ঐ সব ছিদ্র দিয়ে জল ঐ টিনের মধ্যে ঢুকছে। সব ছিদ্র দিয়েই কি একই গতিতে জল ঢুকছে?

জল থেকে এবার টিনটিকে তুলে নাও। দেখো, কিভাবে ঐ সব ছিদ্রপথ দিয়ে জল বেরিয়ে আসছে। একই গতিতে বেরুচ্ছে কি?

এই পরীক্ষা থেকে আমরা জানতে পারি, তরল পদার্থ মাত্রেই চারদিকে সমান চাপ দেয়।

আমরা জানি, কোন জিনিষ জলে ডুবে যায় আবার কোন জিনিষ জলে ভাসে। কোন্ কোন্ জিনিষ জলে ডুবে যায় আর কোন্ কোন্ জিনিষ জলে ভেসে থাকে তার একটা তালিকা তৈরী করো। তরল পদার্থের চাপে কি ক'রে একটা জিনিষ ভেসে থাকে?



এস আমরা তা' দেখি—

শুকনো কাঠের একটা চৌকা খন্ড (ব্লক) নাও। এটা জলে ছেড়ে দাও। আঙ্গুল দিয়ে ওটা নীচের দিকে ঠেলে দাও। কি মনে হবে? নীচে থেকে কিছুতে ঠেলা দিয়ে কাঠটাকে উপরের দিকে আনছে কি?

কাঠটাকে একটা স্প্রিং ব্যালান্সের সঙ্গে বাঁধো। কাঠটার ওজন নাও। ওজনটা তোমার নোট বইতে টুকে রাখো। এবার কাঠের ঐ টুকরোটাকে জলে নামিয়ে দাও। এবার ওজনটা নিয়ে দেখো, তোমার আগের ওজনের চেয়ে বেশি হ'চ্ছে না কম হচ্ছে।



জলের ঊর্ধ্বচাপের ফলে কাঠটা জলে ভেসে থাকে।

যে জিনিষ ডুবে যায়, জলের মধ্যে তার ওজন কি কম হয়?

এস আমরা তা' দেখি—

একটা লোহার চৌকা নাও। স্প্রিং ব্যালান্সের সাহায্যে ওটার ওজন করো।

এবার চৌকাটিকে জলের মধ্যে নামিয়ে দাও। স্প্রিং ব্যালান্সের ওজনটা কত ওঠে দেখো। কি দেখতে পাবে? দেখবে, লোহারও জলের মধ্যে ওজন কম হয়।

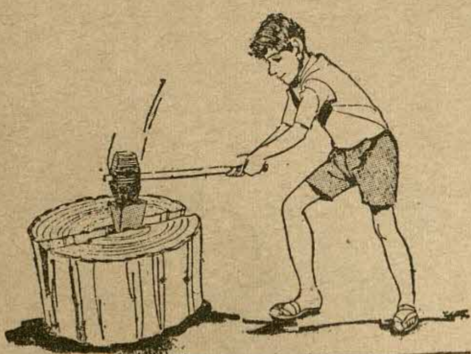
যে সব জিনিষ জলে ডুবে যায় তারও জলের মধ্যে ওজন কম হয়।



একটা সাধারণ ব্যাপারেও এটা জানা যায়। একটা ঘড়া পুকুরের বা নদীর জলে ডুবিয়ে ওটাকে পূর্ণ কর। ঘড়াটার কাণা ধরে অতি সহজেই জলের ভিতর দিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে পারবে; কারণ জলের ঊর্ধ্বচাপের ফলে ওজনটা ক'মে যায়। কিন্তু জল থেকে ঘড়াটাকে তুললে দেখবে তার ওজন বেড়ে গেছে অনেক। তখন ঘড়াটাকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিতেও খুব ভারী বোধ হবে।

যন্ত্রপাতি

যন্ত্র আমাদের কাজ করতে সাহায্য করে; কিন্তু যন্ত্রপাতি নিজে কোন কিছু করতে পারে না। কাঁচি, সাঁড়াশী, যাঁতি, কাঁটা, ছুরি, কপিকল, বাটালী প্রভৃতি সাধারণ যন্ত্র।

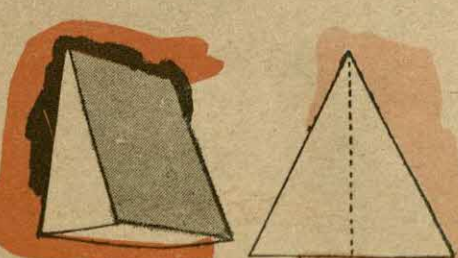


তোমরা সকলেই বাই-সাইকেল দেখেছ। এটাও কি একটা সাধারণ যন্ত্র? না, তা' নয়। এর মধ্যে অনেকগুলি সাধারণ যন্ত্র আছে। কি কি যন্ত্র আছে নাম বল তো?

একটা ছুরি, কি বাটালীর ধারালো মুখটা ভালো করে দেখো। কি দেখতে পাবে? ধারালো মুখটার একদিক বা দু'দিকে ঢালু করা। এটা আসলে একটা 'পেনা'। এই ধরনের পেনা দিয়ে আমরা একটা কিছু কাটতে পারি। কি ক'রে এই ধারালো মুখ দিয়ে কাজ হয়?

একখন্ড কাঠ নাও আর কুড়ুল জাতীয় একটা যন্ত্র। যন্ত্রটার ধারালো মুখটা কাঠের উপর রাখো। একটা হাতুড়ী দিয়ে যন্ত্রটায় আঘাত কর। কাঠখানির কি হবে?

কামারশালায় কুড়ুল কি ক'রে তৈরী করে দেখেছ? দুটো ঢালু লোহার পাত এক সংগে ক'রে করা হয় কুড়ুল বা বাস্।



একটা স্ক্রু নাও। ভালো ক'রে ওটা দেখো। এর আকারটা কেমন বলতে পারো? এটা কি ঢালু সমতলের মত নয়?

এস তা' দেখা যাক—

খানিকটা কাগজ, পেন্সিল আর একটা কাঁচি নাও। কাগজটিকে ছবিতে যেমন

দেখানো হ'য়েছে তেমনি ক'রে কাটো। ওর লম্বা দিকটায় কালো, মোটা দাগ দাও। পেন্সিলটার চারদিকে ছবিতে যেমন দেখানো হ'য়েছে তেমনিভাবে কাগজটা জড়াও। কালো দাগটিকে স্ক্রুর প্যাঁচের মত দেখাচ্ছে কি? এর থেকে আমরা জানতে পারি, স্ক্রুও এক রকম ঢালু সমতল। এটাও আর এক রকমের সাধারণ যন্ত্র। আর কি কি সাধারণ যন্ত্র আছে?



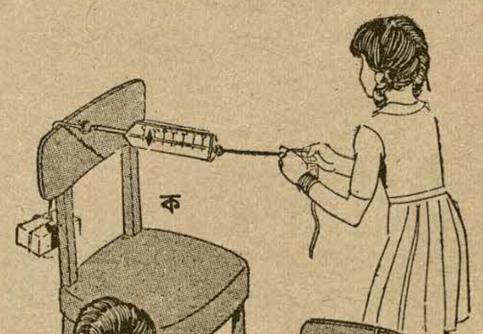
ছবিটির দিকে তাকাও। একটি মেয়েলোক কুয়ো থেকে জল তুলছে। একটা চাকার উপর দিয়ে দড়ি জড়িয়ে সে ওটা টানছে। একটা ধুরোর উপর এই চাকাটা ঘুরছে। এটাকে বলে কপিকল। এটায় আমাদের কি সুবিধা হয়?



এস আমরা তা' দেখি—

একখানা ইট নাও। একটা স্প্রিং ব্যালান্সে ইটখানির ওজন দেখো। ওজনটা তোমার নোটবুকে টুকে রাখো। এবার একটা শক্ত দড়ি দিয়ে ইটখানাকে বাঁধো। দড়িটার অন্য প্রান্তে স্প্রিং ব্যালান্সটা জুড়ে দাও।

ছবিতে যেভাবে দেখানো হ'য়েছে ঐভাবে ঐ দড়িটা একটা চেয়ারের পিঠের দিক দিয়ে ঘুরিয়ে আনো। তারপর স্প্রিং ব্যালান্সটা টানো। ইটখানা যখন নড়তে থাকবে তখন ব্যালান্সটার কত ওজন উঠল টুকে রাখো। আগের ওজন আর পরের ওজন দুটোর মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য হ'ল কি?

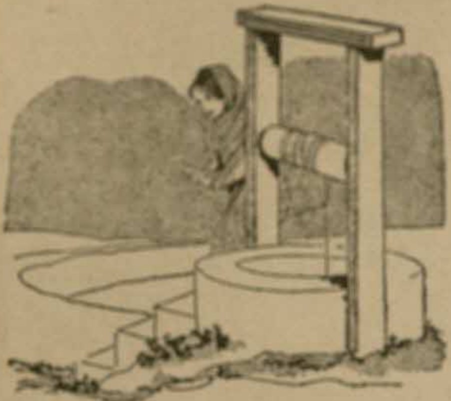


এবার 'পুলি' বা কপিকলটা নাও। যেমন দেখানো হ'য়েছে তেমনিভাবে ওটাকে বসাও। স্প্রিং ব্যালান্সটা টানো। আগের মতো ইটখানা নড়তে থাকলে স্প্রিং ব্যালান্সে ওর কত উঠল দেখো। নোট করো। দুটো ওজনের মধ্যে পার্থক্য কি খুব বেশি? কোন পার্থক্য হবে কেন?

কপিকলের জন্যই দড়িটা সহজে ঘুরে আসতে পারে। এটায় ঘর্ষণও কমিয়ে দেয়। কপিকলে আমাদের কাজ খুব সহজ হয়। 'চরকি কল' নামে আর এক রকমের কল আছে। তা দিয়ে জল তোলা হয়।

চরকি কলে কিভাবে কাজ হয়?

এস আমরা তা দেখি—



চরকির ধুরোর সঙ্গে একটা দড়ি পরাও। দড়িটার আর এক প্রান্তে একখানা ইট বাঁধো। হাতলটা ধরে ঘুরাও। ইটখানা উপরে উঠছে না কি? চরকিও এক রকমের সাধারণ কল। এটা আসলে একটা 'লিভার' বা দণ্ডযন্ত্র।

আমরা কি শিখলাম?

১। বস্তুর ঘনত্ব জলের সঙ্গে তুলনা করা হয়।
২। তরল পদার্থ চারদিকেই চাপ দেয়।
৩। তরল পদার্থের গভীরতা অনুসারে তার গতি বাড়ে।
৪। জলে ডুবিয়ে দেওয়া কোন জিনিষের ওজন জলের বাইরে কম হবে।
৫। তরল পদার্থের ঊর্ধ্বচাপের উপর কোনও বস্তুর ভেসে থাকা নির্ভর করে।
৬। সমতল বস্তুকে ঢালু করে নিলে খিল বা কুড়ুলের মুখের মত হবে।
৭। স্ক্রুও আর একরকমের ঢালু সমতল।
৮। কপিকল একরকমের লিভার বা দণ্ডযন্ত্র।
৯। চরকিও আর একরকমের দণ্ডযন্ত্র।

প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হবে—

১। উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর—

(ক) ....মাপকাঠি হিসাবে ধরে কোনও বস্তু কতখানি ভারী বা হাল্কা তা জানা হয় (বাতাস, জল, গ্রাম)

(খ) পিন বা কীলক এক রকমের..........(দণ্ডযন্ত্র, ঢালু সমতল)

(গ) স্ক্রু এক রকমের..........(দণ্ডযন্ত্র, ঢালু সমতল)

(ঘ) তরল পদার্থ..........চাপ দেয় (উপর দিকে, নীচের দিকে, সব দিকে)

২। 'ক' স্তম্ভের বাক্যাংশকে 'খ' স্তম্ভের বাক্যাংশের সঙ্গে এমনভাবে জুড়ে দাও যাতে একটা যথার্থ উক্তি হয়।

'ক'	'খ'
(অ) লোহা	(অ) আমাদের কাজ সহজ করে
(আ) কপিকল সাহায্য করে	(আ) এক রকমের লিভার
(ই) তরল পদার্থের চাপ বাড়ে	(ই) জলের চেয়ে বেশি ঘন
(ঈ) চর্কি কল	(ঈ) গভীরতা অনুসারে

৩। নীচের উক্তিগুলি পড়ো—

(ক) সাধারণ কল নিজে নিজে কাজ করে না।

(খ) সাধারণ কল আমাদের কাজ করতে সাহায্য করে—উত্তরগুলির মধ্যে কোনটি ঠিক?

(১) দুটি উক্তিই ঠিক।

(২) (ক) উক্তি ঠিক (খ) উক্তি ভুল।

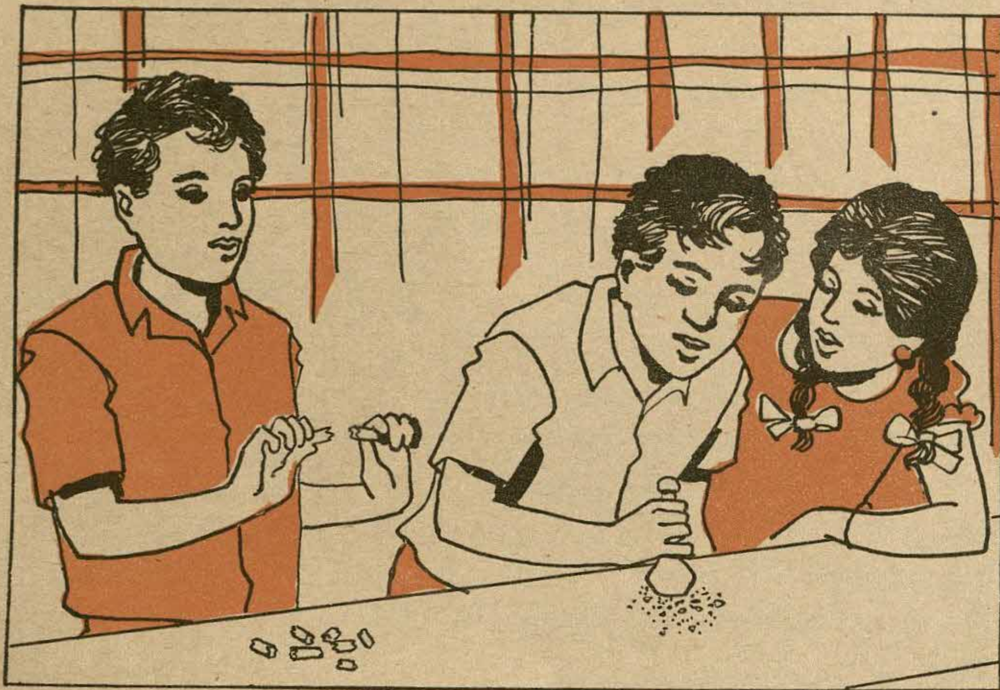
(৩) (খ) উক্তি ঠিক (ক) উক্তি ভুল।

(৪) উভয় উক্তিই ভুল।

যা করতে হবে—

১। যে সব বস্তু জলে ভাসে তার একটা তালিকা প্রস্তুত।

২। একটা কপিকল ও একটা চর্কি কলের নমুনা তৈরী।



একটা চক পেন্সিল নাও। ওটাকে ভেঙ্গে দু'খণ্ড করো। ওর একটা খণ্ড নিয়ে তাকে আবার দু'টুকরো করো। এবার টুকরো দুটি ছোট হ'লো। এর থেকে একটা টুকরো নিয়ে আবার তাকে দু'খণ্ড করো। এইভাবে ক্রমে চক পেন্সিলটাকে টুকরো টুকরো ক'রে ভেঙ্গে যাও। প্রত্যেকটি টুকরোই ক্রমে ছোট হ'য়ে যাবে। কিন্তু তা হ'লেও টুকরোগুলি একই জিনিষ থাকবে—চক।

এইভাবে চক-পেন্সিলটিকে আমরা কতদূর পর্যন্ত ভেঙ্গে যেতে পারি? কিছুক্ষণ পরেই ওগুলি এত ছোট হ'য়ে যাবে যে, হাতে ধ'রে আর ভাঙ্গাই যাবে না।

এইসব ছোট ছোট টুকরো থেকে আরও ছোট টুকরো বের করবার কোন উপায় আছে কি? হ্যাঁ, যাঁতায় পিষে তা করা যেতে পারে।

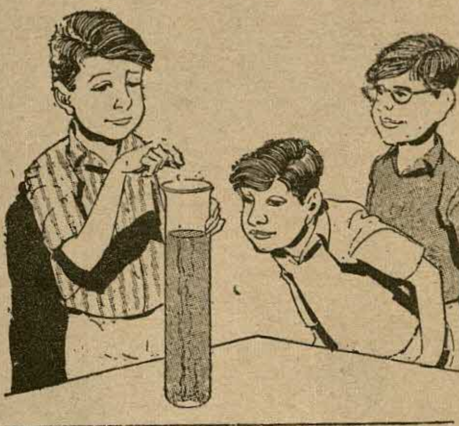
যে সব ছোট ছোট চকের টুকরো হাতে আর ভাঙ্গা যায় না, সেগুলি যাঁতায় পিষে নাও। একটা অতসী কাচ বা 'হ্যান্ড লেনস্' দিয়ে ক্ষুদ্র কণাগুলি দেখো।

সম্ভবত চকের এই গুঁড়োগুলিকে আবার পিষে নিলে আরও সূক্ষ্ম কণা

পাওয়া যেতে পারে। তখন কিন্তু তোমার 'হাত লেনস্' দিয়ে সেগুলিকে আর দেখতে পাবে না।

কোনও একটা জিনিষকে কতদূর সূক্ষ্ম কণায় পরিণত করা যায়?

এস আমরা তা' দেখি—



একটা 'টেষ্ট টিউবে' পাঁচ মিলিলিটার জল নাও। ঐ টেষ্ট টিউবের মধ্যে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের একটা দানা ফেলে দাও। ঐ দানাটা এবং জলটার কি হ'ল দেখো।

পারম্যাঙ্গানেটের দানাটা যখন ডুবে যায় তখন একটা রঙিন ডোরা দাগ পেছনে জলের মধ্যে কেন দেখা দেয়? কিসে ঐ রঙটা হয়?

নিশ্চয় পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট থাকার জন্যই এই রং হয়েছে। দানাটা জলে ডুববার সময় পারম্যাঙ্গানেটের ছোট ছোট কণা ছাড়তে ছাড়তে যায়। ঐগুলিই ডোরা দাগগুলিকে রঙিন করে।

ঐ রঙিন ডোরা দাগগুলিকে একটা 'হ্যান্ড লেনস্' দিয়ে দেখো। দেখবে, ওটা ছড়িয়ে পড়ছে এবং ক্রমেই চওড়া হচ্ছে। ঐ ডোরাতে কোনও রঙিন ক্ষুদ্র কণা দেখতে পাচ্ছ কি? না, সেগুলি এত ছোট যে, খালি চোখে বা হ্যান্ড লেনস্ দিয়ে তাদের দেখা যাবে না। তা' হলে কি ক'রে তুমি বিশ্বাস করবে যে ক্ষুদ্র কণাগুলি ওখানে আছে?

পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের দানাগুলি রঙিন। যখন এইসব দানা জলে গুলে যায়, তখন ওগুলি আরও ক্ষুদ্র অণুতে পরিণত হয়। এইগুলিই জলটাকে রঙিন করে।



চিনি আর একটা সাধারণ জিনিষ যা জলে গুলে যায়। চিনিও কি জলে গুলে গিয়ে আরও ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হয়?

এস আমরা তা' দেখি—

একটা কাচের বড় গেলাস বা একটা 'বীকারের' মধ্যে দু' চামচ চিনির দানা রাখো। পঞ্চাশ মিলিলিটার জল আস্তে আস্তে ঐ বীকারের মধ্যে ঢালো। উপর থেকে চামচেয় ক'রে একটু জল মুখে দিয়ে আস্বাদ নাও। মিষ্টি লাগছে কি জলটা?

কিছুক্ষণ ধরে বীকারের ঐ জলটা চামচ দিয়ে নাড়ো। দানাগুলিকে থিতাতে

দাও। এবার এক চামচ জল মুখে দিয়ে দেখো। আগের আস্বাদ থেকে এবারকার আস্বাদ কিছু পার্থক্য বুঝতে পারছ কি?

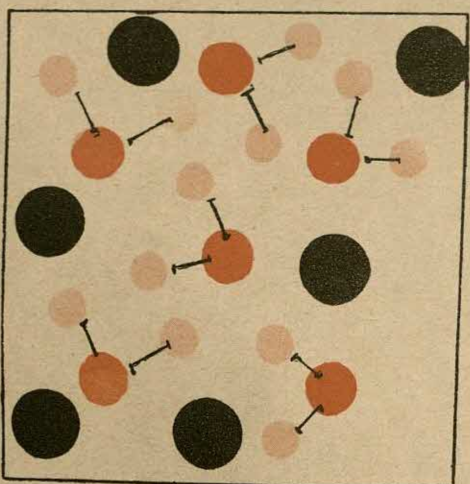


উপরের জলে কোনও চিনির দানা দেখতে পাচ্ছ কি? ওটা মিষ্টি লাগছে কি? যেহেতু উপরের জলটা মিষ্টি, সেজন্য ওর ভিতর নিশ্চয়ই চিনি আছে। কিন্তু ঐ চিনির দানাগুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্র—এত ক্ষুদ্র যে তা দেখা যায় না।

গোড়ার প্রশ্নে এস আমরা ফিরে আসি। চিনির ঐ দানাগুলিকে আমরা কত ছোট করতে পারি?

চিনিটা যখন জলে গুলে যায়, তখন ওটা ছোট ছোট কণায় পরিণত হয়। এগুলিকে বলে চিনির গুঁড়ো। লক্ষ লক্ষ গুঁড়ো দিয়ে এক একটা চিনির দানা তৈরী হয়। এই গুঁড়ো বা কণা হচ্ছে কোনও বস্তুর ক্ষুদ্রতম অবস্থা।

জলে গুলে যায় এমন কঠিন কোন বস্তু থেকেই যে কেবল কণা বা অণু তৈরী হয় তা' নয়। কঠিন, তরল বা বাষ্পীয় যে কোনও বস্তুই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু দিয়ে তৈরী।



যেমন জলকণা দিয়ে তৈরী হয় বরফ। বরফ যখন গলে, ঐ সব জলকণাই আবার জলে পরিণত হয়। উত্তাপ দিলে জল বাষ্পে পরিণত হয়। বাষ্পও ঐ জলকণারই সমষ্টি। এইভাবে বরফ, জল এবং বাষ্প সবগুলিরই গোড়ায় রয়েছে জলকণা। এইজন্য একই জলকণার বিভিন্ন অবস্থা হচ্ছে ওগুলি।

দেওয়ালের ইটের মত কোন বস্তুর কণাগুলো কি একসংগে জমাট বেঁধে থাকে? না, দুটো কণার মধ্যে ফাঁক থাকে?

এস আমরা তা' দেখি—

একটা কাচের জার নাও। জারটির বাইরের গায়ে একটা কাগজের ফালি আঠা দিয়ে এঁটে নাও। কাগজটায় একটা চিহ্ন করো। এই চিহ্নটা পর্যন্ত জারটির মধ্যে জল ঢালো। তারপর ওর মধ্যে চার চামচ নুন দাও। এবার জলের লেভেলটা কোথায় এলো চিহ্ন করে রাখো।



একটা চামচ দিয়ে নেড়ে নুনটা গুলে নাও। আবার জলের লেভেলটা কোথায় এলো চিহ্নিত করো। এই তিনটি জলের লেভেলের মধ্যে কি পার্থক্য দেখতে পাচ্ছ?

এই কাজটা চিনি, কপার সালফেট প্রভৃতি আরও কয়েকটি দ্রবণীয় কঠিন পদার্থ নিয়ে করো। প্রত্যেক স্থলেই কি আয়তনের কোন পরিবর্তন হচ্ছে? ফলগুলি কিভাবে তুলনা করা যায়?

গ'লে যাওয়া বস্তুর কণাগুলি দু'টি জলকণার মাঝখানে জায়গা ক'রে নেয়। এইজন্য বস্তুটি জলে গুলে গেলে জারটির জলের লেভেলে নেমে যায়।

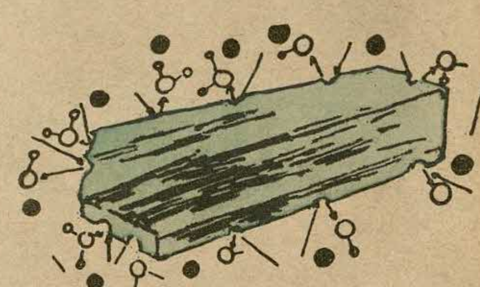
সমস্ত বস্তুর কণাই একটা আর একটা থেকে জায়গা রেখে পৃথক হয়। যখন কোন বস্তু জলে গুলে যায়, তখন তার কণাগুলি জলকণার ফাঁকে ফাঁকে ঢুকে পড়ে। যদি কোন বস্তুর কণাগুলি আকারে ছোট হয়, তা হ'লে জলকণাগুলির ফাঁকে সহজেই তারা জায়গা করে নেয়। দুটি কণার মাঝখানে ফাঁক থাকে। কিন্তু কণাগুলি কি স্থির না চঞ্চল?

এস আমরা তা' দেখি—

একটা জলপূর্ণ টেষ্ট টিউবের মধ্যে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের কয়েকটা দানা ছেড়ে দাও। টিউবটাকে নাড়াচাড়া না ক'রে রেখে দাও। রংটা সমস্ত জলে ছড়িয়ে পড়তে কত সময় লাগবে? কেউ জলটাকে না নাড়লে কি ক'রে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ছড়িয়ে পড়ে?

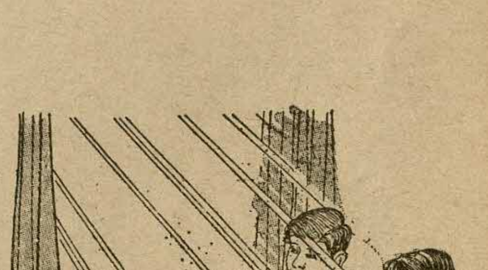
সম্ভবত জলকণাগুলি গতিশীল। চলন্ত অবস্থায় সেগুলি পারম্যাঙ্গানেটের দানাগুলিকে আঘাত করে এবং তার থেকে কতকগুলি কণাকে সরিয়ে দেয়। এইভাবে জলকণাগুলি পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটকে সমস্ত জলে ছড়িয়ে দেয়।

বাষ্প বা বাতাসের কণাগুলিও কি গতিশীল?



এস আমরা তা' দেখি—

তোমাদের ঘরের দরজা-জানালাগুলি সব বন্ধ ক'রে দাও। তারপর যেদিক থেকে রোদ আসছে, সেইদিককার দরজা বা জানালা একটু ফাঁক ক'রে রাখো। যে ফাঁক দিয়ে রোদ আসছে সেখানে কি দেখতে পাচ্ছ? কোন্ দিকে ধূলি-কণা-গুলি চলাফেরা করছে?



দেখবে, ধূলি-কণাগুলি সব দিকেই ভেসে বেড়াচ্ছে। মনে হ'চ্ছে যেন কোন কিছুতে ওদের সব সময় আঘাত করছে। তার ফলে ধূলিকণাগুলি সব দিকেই ছুটাছুটি করছে। বাতাসের কণাগুলি নিরন্তর ধূলিকণাকে আঘাত করছে। তার ফলে ধূলিকণাগুলি ছোটাছুটি করছে।

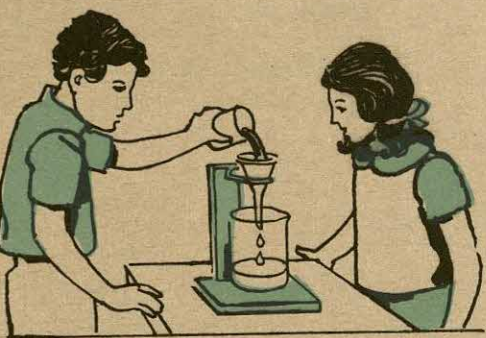
এর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, সমস্ত কণারই গতি আছে।

কঠিন জিনিষ জলে গুলে দ্রবীভূত পদার্থ হয়। বলতে পারো, কি ক'রে একটা দ্রবীভূত পদার্থকে আবার কঠিন পদার্থে ফিরিয়ে আনা যায়?

এস তা' দেখা যাক—

একটা বীকারের অর্ধেকটায় জল পুরে দু' চামচ সাধারণ নুন তার মধ্যে গুলে নাও। নুনটা যতক্ষণ গুলে না যায় জলটা নাড়তে থাকো। জলের উপর কোনও ময়লা ভেসে উঠছে কি? ওগুলোকে কি ক'রে দূর করা যায়?

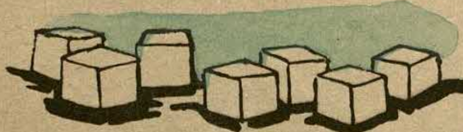
গুলা-জলটাকে ফিলটার ক'রে নাও। ওর অর্ধেকটা জল এবার আর একটা পাত্রে রাখো।



ঐ পাত্রটায় উত্তাপ দিয়ে নুন-গুলা-জলটাকে বাষ্প করে উবিয়ে দাও। কি পড়ে থাকল পাত্রটির তলায়? সাধারণ নুন থেকে কি ওটা অন্য রকম?

অন্য পাত্রটির গুলা-জলটা নাড়াচাড়া ক'রো না। আস্তে আস্তে ওটা উবে যাক্। দিন তিনেক ধরে ওটা দেখে যাও। কি পড়ে থাকল ওর তলায়? এটা কি নুন থেকে অন্য রকম কিছু? অন্য পাত্রটিতে যে তলানী পড়ে আছে তার থেকে কি এটা আলাদা?

দুটো পাত্রের তলানীই সাধারণ নুনের দানা। দ্বিতীয় পাত্রের জলটা আস্তে আস্তে উবে যাওয়ায় দানাগুলি বড় হ'য়েছে। সাধারণ নুনের দানাগুলো বড় হয়। তার কারণ সমুদ্রের জল একটা অগভীর গর্তে রেখে আস্তে আস্তে জলটা উবিয়ে দিলে ওটা পাওয়া যায়।



বহু রকমের নুন আছে। সাধারণ নুন তার মধ্যে একটা। অন্যান্য 'সল্ট' বেশির ভাগ কৃষি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। যেমন, এ্যামোনিয়াম সালফেট, ক্যালসিয়াম ফসফেট এইসব। এগুলির সম্বন্ধে জেনে রাখা খুবই দরকার।

গাছের গোড়ায় এ্যামোনিয়াম সালফেট দিলে কি হয়?

এস তা' দেখা যাক্—

একই রকম মাটির টবে রাখা দুটি চারাগাছ নাও। ওর একটা টবের গাছের গোড়ায় এ্যামোনিয়াম সালফেট গুলা-জল দাও। দুটি গাছেই নিয়মিতভাবে জল দিয়ে যাও। কয়েকদিন গাছ দুটিকে লক্ষ্য কর। ওদের মধ্যে বাড়বার দিক দিয়ে কোনও পার্থক্য দেখতে পাচ্ছ কি? এ্যামোনিয়াম সালফেট হ'চ্ছে এক রকম সার। এটা গাছটিকে বেশি ক'রে নাইট্রোজেন দেয়। তাই যে গাছে এটা দেওয়া যায় সেটা পুষ্ট হয় এবং তাড়াতাড়ি বাড়ে।



ফসফেট সার গাছে দিলে বাড়ার দিক দিয়ে তার কি ফল হয়?

এস আমরা তা' দেখি-

একই রকম দুটো টবের গাছ নাও। ওর একটার মাটিতে কিছু ফসফেট দাও। জল দুটো টবেই নিয়মিত দিয়ে যাও। কয়েকদিন পরে টব দুটির গাছের মধ্যে বাড়বার দিকে কি পার্থক্য দেখতে পাও?



নাইট্রোজেন ছাড়াও চারাগাছ তার যথাযথ বাড়বার জন্যে ফসফরাস চায়। ফসফেট থেকে তা পাওয়া যায়।

শস্য যখন মাঠে জন্মায়, তখন তারা তাদের বাড়বার জন্য জমি থেকে কিছু পুষ্টিকর জিনিষ তুলে নেয়। নাইট্রোজেন, ফসফরাস আর পটাশিয়াম এই তিনটি হ'চ্ছে প্রধান পুষ্টিকর জিনিষ। পর পর কয়েকবার শস্য উৎপন্ন হ'লে জমির এই পুষ্টিকর জিনিষ কমে যায়। এই কমতিটা পুরে নেবার জন্যে জমিতে সার দেওয়া হয়।

আমরা কি শিখলাম?

১। সমস্ত পদার্থই ছোট ছোট কণা দিয়ে তৈরী—যাকে বলা হয় অণু।
২। অণুগুলি এত ছোট যে ওদের চোখে দেখা যায় না।
৩। অণুগুলির পরস্পরের মধ্যে ফাঁক থাকে।
৪। অণুগুলি সবসময় গতিবিশিষ্ট।
৫। কঠিন দ্রব্য গুলে গিয়ে সাধারণত দানারূপে আলাদা হয়।
৬। গাছপালার বাড়বার জন্য সারের খুব দরকার।

প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হবে—

১। নীচের প্রশ্নগুলির তিনটি ক'রে উত্তর দেওয়া আছে প্রশ্নের তলায়। যে উত্তরটি সঠিক ব'লে মনে হবে, সেই উত্তরটার পাশে একটা ক'রে দাগ (টিক মার্ক) দাও—

(ক) একটা পদার্থকে ভেঙ্গে সব চাইতে ছোট কি করা যায়?

(১) সব চাইতে ক্ষুদ্র জিনিষটা হ'চ্ছে দানা।

(২) ধুলাই হ'চ্ছে সবচেয়ে ছোট।

(৩) অণু হ'চ্ছে সব চাইতে ছোট।

(খ) একটা পুড়ন্ত ধূপকাঠির সুগন্ধ বন্ধঘরের চারদিকে শীঘ্রই ছড়িয়ে পড়ে। তার কারণ—

(১) বাতাসের কণাগুলো চলমান।

(২) বাতাস বইতে থাকে।

(৩) দরজা বন্ধ।

(গ) একটা নুন-গুলা-জল থেকে যদি নুনের দানা পেতে চাও, তা হ'লে তোমাকে—

(১) তলানী পড়ে থাকে এমনভাবে ধীরে ধীরে ঐ নুন-গুলা-জলটা অন্য পাত্রে ঢালতে হবে।

(২) ঐ নুন-গুলা-জল থেকে জলটাকে আস্তে আস্তে বাষ্পাকারে উড়িয়ে দিতে হবে।

(৩) একটা বীকারে জলটাকে ফিলটার করে নিতে হবে।

(ঘ) শস্য উৎপাদন করবার জন্য জমিকে বার বার ব্যবহার করবার পর জমিতে সার দেওয়া খুবই দরকার, কারণ—

(১) আগের শস্যগুলি জমির পুষ্টিকর জিনিষগুলি নিয়ে নেয়।

(২) জমিটা একই শস্য উৎপাদনে শ্রান্ত হ'য়ে পড়ে।

(৩) বাজারে সার খুবই কম দামে পাওয়া যায়।

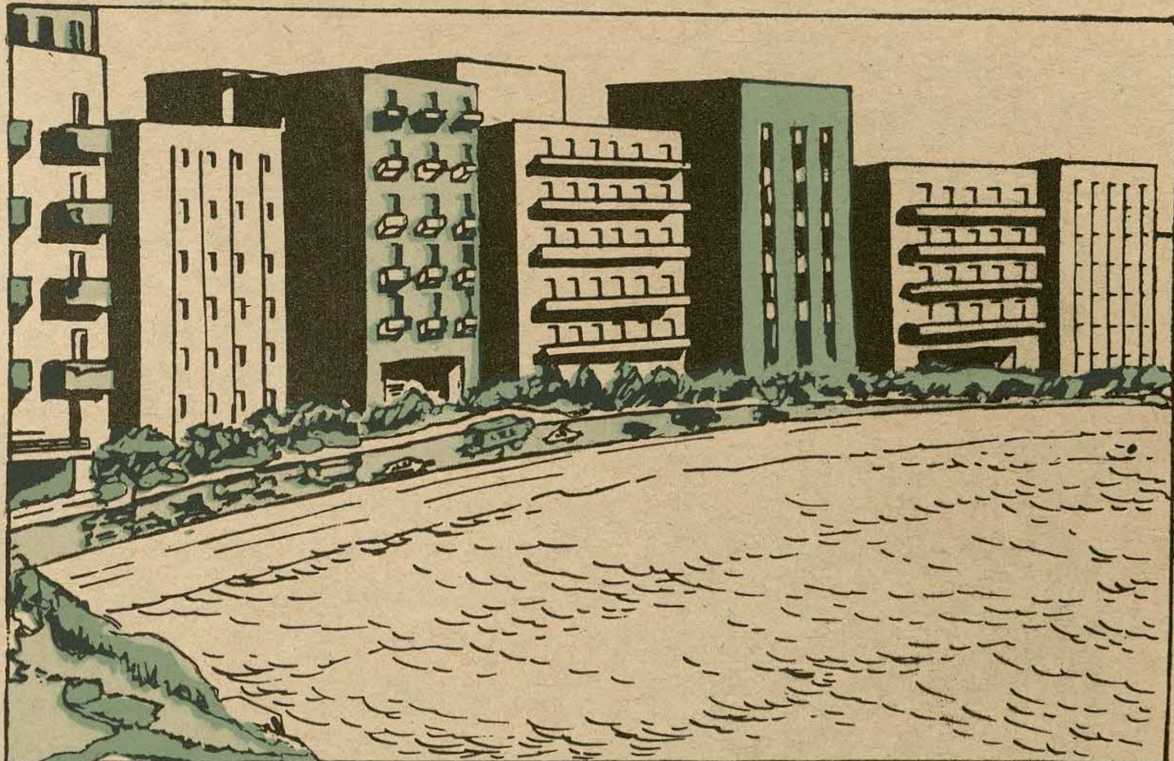
২। একটা জলের নমুনা তোমাকে দেওয়া হ'ল। তুমি কি ক'রে বের করবে যে ওতে কোনও গুলে যাওয়া জিনিষ আছে কিনা?

যা করতে হবে—

১। স্থানীয় চাষীরা কোন্ ধরনের সার ব্যবহার করে তা জেনে নিতে হবে।

২। ফিটকিরির একটা ঘন গুলা-জল থেকে বড় দানা বের কর।

ঘরবাড়ী তৈরী

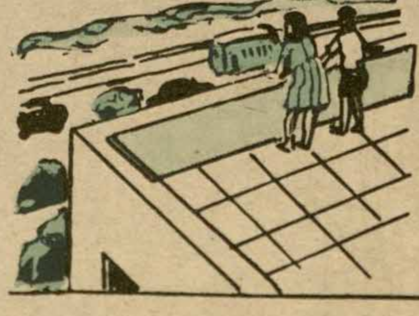


আমাদের দেশে বিভিন্ন রকমের ঘর-বাড়ী দেখা যায়। শহরের বড় বড় ফ্ল্যাট বাড়ী আছে। ফ্ল্যাট অনেকটা বাড়ীর মতই। এতে শোওয়ার ঘর, বসবার ঘর, স্নানের ঘর ও রান্নাঘর থাকে। স্নানের ঘরের একদিকে পায়খানার ব্যবস্থাও করা হয়। কিন্তু ফ্ল্যাট বাড়ীর চারদিকে জমি থাকে না; কারণ ওটা অন্যান্য ফ্ল্যাট বাড়ী দিয়ে ঘেরা থাকে।



বড় বড় শহরের ফ্ল্যাটগুলি কুড়ি-পঁচিশ তলা কি তারও বেশি থাকে। এই বাড়ীগলি খুবই উঁচু। এক একটা ফ্ল্যাটে লোকও বাস করে অনেক।

মনে কর তুমি বোম্বে শহরের সমুদ্রের ধারের একটা এগার তলা বাড়ীতে বাস ক'রছ। উপর থেকে তুমি সমুদ্রের এবং বন্দরের সব জাহাজগুলিই দেখতে পাবে। অনেক নীচেয় তুমি দেখতে পাবে মোটর গাড়ী, লরী, বাস রাস্তা দিয়ে ছুটছে। ওগুলিকে খেলনা গাড়ীর মত ছোট্ট মনে হবে। কলকাতায় গঙ্গার ধারের পনরতলা বাড়ীর উপর গেলেও ঠিক এই রকম সব দেখতে পাবে।



সব বাড়ীরই ভিত্‌টা হওয়া চাই ভালো। কোনও বাড়ীর ভিত্‌ তৈরী দেখেছ



কি? ভিতটা মাটির উপরে থাকে না তলা থেকে তোলা হয়? ফ্ল্যাট বাড়ীগুলি তৈরী করতে হ'লে কংক্রিট আর ইস্পাত লোহা চাই। এইসব বাড়ীর ভিত খুব গভীর এবং শক্ত লোহার ফ্রেমের সাহায্যে করা হয়।

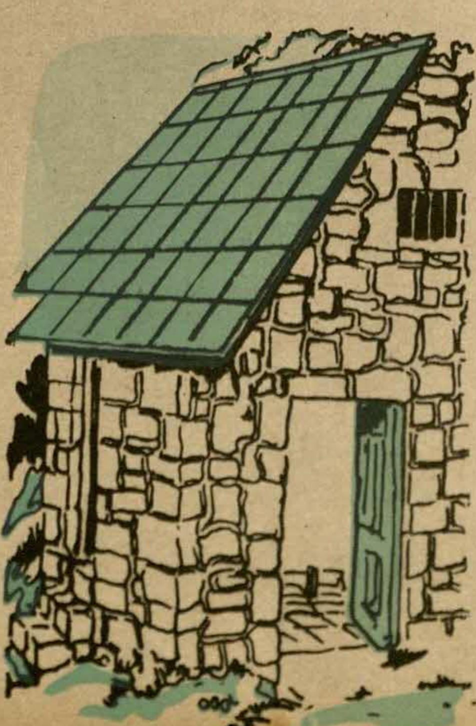
পাহাড়ে জায়গায় মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে পাহাড় বেরিয়ে পড়লে ঐ পাহাড় কেটে তার মধ্যে কংক্রিট আর লোহার ফ্রেম ক'রে ভিত ক'রে নেওয়া হয়। তার উপর ওঠে বাড়ী।

অধিকাংশ বাড়ীতেই ইট দিয়ে দেওয়াল করা হয়। তারপর ওর উপর প্লাসটার অর্থাৎ সিমেণ্ট-বালির প্রলেপ দিয়ে নেয়। এই প্রলেপটা দেওয়ার উদ্দেশ্য কি? প্রলেপের উপর আবার কখনও কখনও চুণকাম করা হয় কেন?



আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই মাটির তৈরী ইট, পাথর, কাঠ বা বাঁশের তৈরী ছোট বাড়ীতে বাস করে। পাহাড়ে জায়গায় শীতকালে খুবই ঠাণ্ডা পড়ে। ওখানকার বাইরের দেওয়ালগুলি প্রায়ই পাথরের তৈরী। ভিতরের দেওয়াল আর মেঝে থাকে কাঠের। দেওয়ালগুলি খুব পুরু আর শক্ত। এভাবে ওখানকার দেওয়াল তৈরী হয় কেন?

পাহাড় অঞ্চলের বাড়ীগুলির ছাদ সাধারণত ঢালু করে করা হয়। তা'তে ওর উপর বরফ জমে থাকতে পারে না। বরফ ছাদে আসলেই সেটা গড়িয়ে নীচে প'ড়ে যায়।

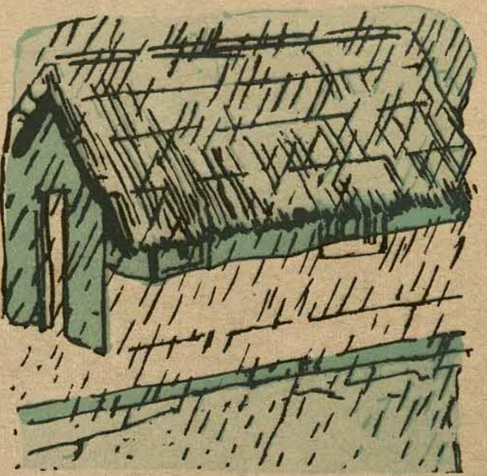


আমাদের দেশের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, কেরালা এবং তেরাই অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। অনেক গ্রামের বাড়ীতে খড়ের পুরু চাল থাকে। তালপাতার ছাউনী দিয়েও কেউ কেউ ঘর তৈরী করে। গোলপাতা দিয়েও ঘর করা যায়। গোলপাতা কিন্তু গোল নয়। ওগুলি দেখতে কিছুটা তালপাতার মতই। সুন্দরবন অঞ্চলে গোলপাতা পাওয়া যায়। ঘরের ঢালু চালগুলি দেওয়ালের উপর দিয়ে নেমে থাকে। কেন এমন করা হয় বলতে পার?

ঘরের চারদিক দিয়ে নালা বা ড্রেন কেটে রাখা দরকার। অধিক বৃষ্টিপাতের সময় চাল বেয়ে যে জল পড়ে সেটা ঐ নালা দিয়ে বেরিয়ে যায়। জলটা বেরিয়ে যদি না যেত তা'হলে কি হ'ত বল তো?

য সব জায়গায় বৃষ্টিপাত কম, সেখানকার ঘরের ছাদগুলো হয় সমতল। ঘরের জানালায় বা গরাদে লোহার রড দেওয়া থাকে। এজন্য রাত্রিতেও গরম থাকে। এজন্য লোকেরা বাইরে বা ঘরের ছাদে ঘুমাতে পছন্দ করে। এখানে বেশ ঠাণ্ডা।

আলো-বাতাসের জন্য আমাদের ঘরে জানালা-দরজা দরকার। প্রায় সব বাড়ীর ঘরের জানালায় বা গরাদে লোহার রড দেওয়া থাকে। এজন্য রাত্রিতেও জানালাগুলি নিরাপদে খুলে রাখা যায়।



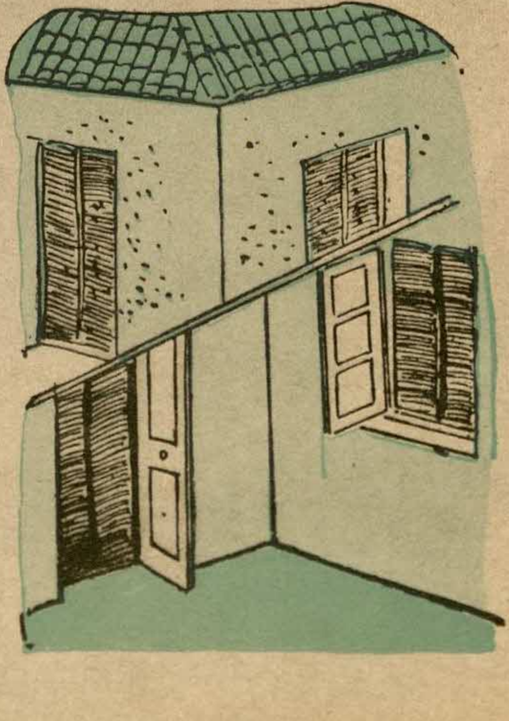
দিনে মাছি ও অন্যান্য পোকা-মাকড় আহারের খোঁজে চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। ঘরের ভিতর যাতে ওগুলো ঢুকতে না পারে সেজন্য কোন কোন বাড়ীর দরজা-জানালায় বাঁশের সরু ফালির চিক দেওয়া হয়। অনেক বাড়ীতে আবার তারের জাল দিয়েও দরজা-জানালা ঢেকে দেয়।

ছোট ছোট গ্রামের বাড়ীতে দরজা-জানালায় পর্দা দেওয়ার নিয়ম আছে। পর্দা থাকলে ঘরে মাছিরা ঢুকতে পারে না। সূর্যের আলো ও উত্তাপ থেকেও পর্দা রক্ষা করে।



কোথায়ও বাড়ী করতে হ'লে সেখানকার জলবায়ুর কথা ভাবতে হবে। তা'ছাড়া সেখানে বাড়ী তৈরীর কি কি জিনিষ সহজে পাওয়া যাবে সেটাও দেখা দরকার। হাতে প্রয়োজনীয় টাকা থাকলে তবেই বাড়ী তৈরীর কাজে নামা উচিত।

পাহাড় অঞ্চলে বাড়ী তৈরীর কি কি জিনিষ পাওয়া যায়? সেখানে আমরা পাথর-কাটা ইট দিয়ে ঘর তৈরী করতে দেখি কেন? ওখানে অনেক বাড়ী আবার কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরী। তার কারণ, ও অঞ্চলে তক্তা তৈরীর গাছ প্রচুর জন্মে।



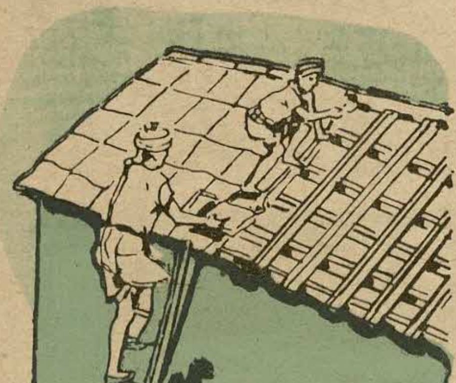
কাঠের তৈরী বাড়ীতে বাস করা বেশ আরামের। কিন্তু যেখানে বেশি ঝড় হয়, সেখানকার কাঠের বাড়ী ঝড়ে উড়ে যেতে পারে। এইজন্য সেখানকার বাড়ীর দেওয়াল ও ছাদ পাথর দিয়ে তৈরী করা হয়।

সমতল অঞ্চলে যেখানে অনেক প্রশস্ত পাহাড় আছে, সেখানটায় বাড়ী তৈরী করা যেতে পারে। অনেক অঞ্চলে পাকা ইটের জন্য ভালো মাটি পাওয়া যায়। তোমরা ইটের পাঁজা বা ভাটা নিশ্চয় দেখে থাকবে। ইটগুলি তৈরীর পর ভাটা বা পাঁজায় পুড়িয়ে নেওয়া হয়। পোড়ানোর পর ইটগুলি খুব শক্ত হয় এবং



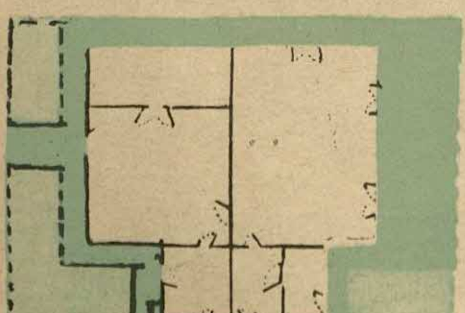
আকারটাও ঠিক থাকে। পাকাবাড়ী তৈরী করতে ইট খুবই ভালো। তাই আমাদের দেশে প্রতি বছরই বেশী ক'রে পাকাবাড়ী তৈরী হ'চ্ছে।

ছাদে টালী দেওয়াও চলে। টালীও মাটি দিয়ে তৈরী। টালী তৈরী ক'রে ইটের মতই পুড়িয়ে নেওয়া হয়। কাঠ দিয়ে ফ্রেম ক'রে তার উপর টালী বিছিয়ে দেয়।

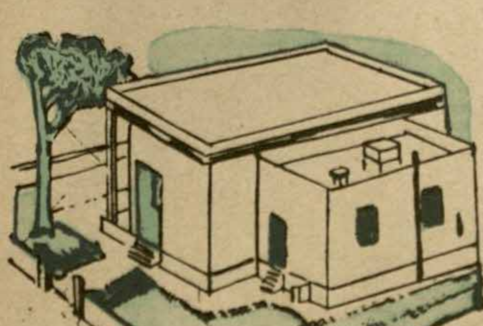


আসাম এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে, যেখানে বৃষ্টিপাত বেশি হয়, বাঁশ জন্মে। বাঁশ কেটে ফেড়ে নিয়ে তারপর বাঁশের ফালি দিয়ে বুনানী করে ঘরের বেড়া করা হয়। এটা সস্তা এবং কাজেরও হয়।

বাড়ী তৈরী করতে গেলে টাকার খুবই দরকার। মালমসলা কিনতে, রাজমিস্ত্রী ও জোগানের পারিশ্রমিক দিতে টাকা চাই। টাকা থাকলে অনেকগুলি ঘর ক'রে খুব বড় একটা পাকাবাড়ী তৈরী করা যায়। কম টাকা থাকলে বাড়ীটাও করতে হবে ছোট।



বাড়ী তৈরী করবার আগে তার একটা নক্সা করে নেওয়া উচিত। শোওয়ার ঘর ও বাস করবার ঘরগুলিতে মুখোমুখী 'ভেন্টিলেসন' বা বায়ু চলাচলের পথ থাকা উচিত। রান্নাঘর থাকবে আলাদা। স্নানের ঘর ও পায়খানাও আলাদা আলাদা হবে। ঘরের দেওয়াল ও ছাদ এমনভাবে হবে যাতে ঝড়-বৃষ্টি এবং ঠাণ্ডা-গরমকে রোধ করতে পারে।



জল বেরিয়ে যাবার জন্যও বাড়ীতে ভালো নর্দমা থাকা দরকার। মেঝে হবে শক্ত এবং সহজেই যাতে পরিষ্কার করা যায় এমন হবে। রান্নাঘরের ধোঁয়া বেরিয়ে যাওয়ার চিমনী থাকা উচিত।

বাড়ী তৈরী করবার সময় এসব দিকে যদি লক্ষ্য রাখা যায়, তা'হলে বাড়ীটি অনেক উপকারে আসবে।

আমরা কি শিখলাম?

১। ভালো বাড়ী করতে হ'লে শক্ত ভিত্ চাই।
২। পাথর, ইট, কাঠ প্রভৃতি বিভিন্ন জিনিষ দিয়ে বাড়ী তৈরী করা যায়।
৩। কোন কোন বাড়ী কংক্রিট ও লোহার ফ্রেম দিয়ে তৈরী।
৪। বাড়ীর দেওয়াল ও ছাদ এমন হবে যাতে ঝড়-বৃষ্টি ও ঠাণ্ডা-গরম থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
৫। বাড়ীতে ভালো নর্দমা থাকবে।
৬। ভেবেচিন্তে প্ল্যান তৈরী করে তবে বাড়ী করা উচিত।

প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হবে—

১। বাড়ী তৈরীর আগে যত্ন করে প্ল্যান তৈরীর দরকার কেন?
২। বাড়ী তৈরী করতে হ'লে অর্থ ও জলবায়ুর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে কেন?
৩। একখানি মাত্র বাড়ী না ক'রে অনেক শহরে বিভিন্ন ব্লক-এ ফ্ল্যাট করে বড় বড় বাড়ী করা হয় কেন?



তোমরা কি জান যে, আমরা আমাদের বেশির ভাগ খাদ্যই গাছপালার কাছ থেকে পাই? আমরা যে ভাত খাই, তার চাল আসে ধান গাছ থেকে। রুটির জন্য ময়দা পাই আমরা গম গাছ থেকে। মুগ, মুসুরী, কলাই প্রভৃতি শস্যের গাছ থেকে আমরা ডাল পাই।

উপরের ছবিতে বিভিন্ন খাদ্য এবং যেসব গাছ থেকে ওগুলি পাওয়া যায় তা' দেখানো হ'য়েছে। গাছগুলির নাম ও তার থেকে আমরা কি খাদ্য পাই তা' বলো।

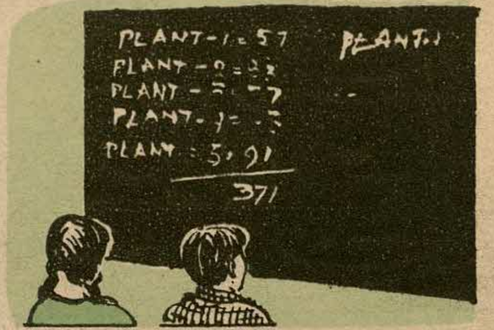


একটা গাছে অনেক বীজ হয়। ওর কোন কোন বীজটাই আসলে ফল, কিন্তু তবুও তাদের আমরা বীজই বলি। একটা ধান গাছ বা গম গাছ থেকে কত-গুলি বীজ পাওয়া যায়?

এস আমরা তা' দেখি—

শস্য কাটবার সময় ধারেকাছে কোন একটা খামারে চলো। চাষী ভাইয়ের কাছ থেকে দশটা ধান বা গমের গাছ চেয়ে নাও। বীজগুলি যাতে ঝ'রে না

যায় এমনভাবে সযত্নে গাছগুলি ক্লাশঘরে নিয়ে এসো। ক্লাশে সমান সংখ্যক ছাত্র নিয়ে দশটা দল করো। প্রত্যেক দলকে একটা ক'রে গাছ দাও। খবরের কাগজ পেতে প্রত্যেক দল তাদের গাছের বীজগুলি ছাড়িয়ে ওগুলি গুণে দেখবে। তারপর নোট বইয়ে প্রত্যেক দল তাদের বীজের সংখ্যাগুলি লিখে রাখবে।



প্রত্যেক দলের পরিচালক তাদের বীজের সংখ্যা ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে রাখতে পারে। প্রত্যেকের বীজের সংখ্যা লিখে নিয়ে তারপর সংখ্যাগুলি যোগ কর। প্রত্যেকটি গাছের বীজ সংখ্যা অপরটির চেয়ে কম-বেশি হ'তে পারে। প্রতি গাছের গড় বীজ সংখ্যা কত বলতে পার?



গম এবং ধান গাছ থেকে অনেক বীজ হয়। এর কতকগুলি পাকলে ঝ'রে পড়ে। ঝড়-বৃষ্টিতে সেগুলি সরিয়ে ফেলতে পারে। পাখী, মেঠো ইঁদুর এবং পোকা-মাকড়েও অনেক বীজ খেয়ে ফেলে।

একজন চাষীভাই একটা গাছ থেকে মোটামুটি কতগুলি বীজ পায়, এস আমরা তা' আলোচনা করি। একটা ধান গাছে যদি একশোটা বীজ পাকে, ধরে নেওয়া যাক তার দশটা ঝড়-বৃষ্টিতে এদিকে-ওদিকে চলে গেল। শস্যটা কাটবার আগেই পাখী, কীট-পতঙ্গ এবং ইঁদুরে ধরা যাক কুড়িটা খেয়ে ফেলল। তা হ'লে কৃষক তার একটা গাছে একশোটা বীজের মধ্যে পেলো মাত্র সত্তরটা। এর মধ্যে তাকে আবার আগামী বছরের বীজের জন্য রাখতে হবে প্রায় দশটা বীজ।

বীজ মাটিতে অঙ্কুরিত হ'য়ে নতুন গাছ হয়। কিন্তু মাটিতে পড়লেই যে বীজ অঙ্কুরিত হবে তা' নয়। কি কি অবস্থায় বীজ অঙ্কুরিত হ'তে পারে?

এস আমরা তা' দেখি—

অল্প কিছু সরষের বা ছোলার বীজ নাও। বীজগুলিকে দু'ভাগ কর। ওর এক ভাগ একটা ভিজে কাপড়ে বাটির মধ্যে রেখে মাঝে মাঝে জল ছিটিয়ে দাও। আর এক ভাগ একটা শুকনো কাপড়ে রেখে ওগুলি যাতে ইঁদুর বা অন্য কিছুতে না খেতে পারে এমন জায়গায় রাখো। তিন-চারদিন পরে উভয় শস্য বীজই দেখো। কি দেখতে পাবে? মাত্র ঐ ভিজে কাপড়ের বীজগুলিই অঙ্কুরিত হ'য়েছে কেন?



আচ্ছা, জল ছাড়াও আর কি কি অবস্থার জন্য বীজ অঙ্কুরিত হতে পারে?



এস আমরা তা' দেখি—

এক লিটার জল পাঁচ-ছ' মিনিট ধরে ফুটিয়ে নাও। জল ফুটালে তার ভিতরের বাতাসটা চলে যায়। তারপর জলটা ঠাণ্ডা ক'রে নাও।

এবার পাঁচটা পাঁচটা ক'রে দু'ভাগে দশটা সিমের বীজ নাও। ওর পাঁচটা একটা শুকনো জারের মধ্যে রাখো। তারপর আস্তে আস্তে ঐ জারে ঠাণ্ডা জলটা ঢালো। নজর রেখো, যেন বুদ্বুদ না ওঠে। জারটার কাণায় কাণায় জল ঢালো। তারপর ঢাকনী এ'টে দাও।

ঠিক ঐ রকম আর একটা জার নাও। ওর মধ্যে বাকী আর পাঁচটা বীজ ছেড়ে দাও। বীজগুলি যাতে ভিজে থাকে সেই পরিমাণে ঐ ঠাণ্ডা জল ওর মধ্যে ঢেলে দাও। এই জারটির মুখ কিন্তু খোলা রাখতে হবে। এবার দুটো জারই ঘরের এক কোণে রেখে দাও। এইভাবে কিছুদিন রেখে দিয়ে বীজগুলি লক্ষ্য কর। কোন্ জারের বীজ কি রকম হ'চ্ছে?

এর থেকে আমরা দেখতে পাবো, বীজ তাদের অঙ্কুর বের করবার জন্য জল, বাতাস দুই-ই চায়। ওরা উত্তাপও চায়।



এইজন্য আমাদের দেশের পাহাড় অঞ্চলে শীতকালে বীজের অঙ্কুর বের হয় না। ওখানকার আবহাওয়া তখন অত্যন্ত ঠাণ্ডা। তার ফলে বীজ থেকে অঙ্কুর বেরতে পারে না।

ভারতের অধিকাংশ কৃষকই বর্ষা নামবার সঙ্গে সঙ্গে ধান বুনে দেয়। জল এবং গরম হাওয়ায় বীজ অঙ্কুরিত হয়। তারপর বীজখোলা থেকে চারাগাছ-গুলিকে নিয়ে জলকাদার জমিতে লাগানো হয়। এখানে চারাগুলি তাড়াতাড়ি বাড়ে।

কৃষক ধানগাছের চারাগুলিকে বেশ ফাঁক ফাঁক লাইন করে সারা মাঠে পুতে দেয়। এভাবে সে কেন লাগায়?



এস আমরা তা' দেখি—

পাশের জঙ্গলের ছবিটার দিকে তাকাও। দেখতে পাবে, জঙ্গলের কোন কোন গাছ বেশ বড় ও মোটা। আর কতকগুলি ছোটো আর বে'টে। আবার কোন কোন গাছ মরেও গেছে। কেন এমন হ'ল বল তো?

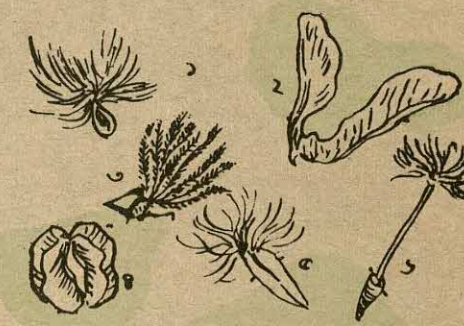
সম্ভবতঃ সমস্ত গাছ জন্মাবার মত যথেষ্ট জায়গা নেই ওখানে। হয়ত প্রত্যেকটি গাছের জন্য যথেষ্ট আলো নেই। আমরা জানি, খাদ্য তৈরীর জন্য গাছের

আলো দরকার। সমস্ত প্রাণীরই বাঁচবার আর বড় হওয়ার মত জায়গা চাই। জঙ্গলের কতকগুলি গাছ বাড়ছে আবার কতকগুলি ম'রে যাচ্ছে কেন?



একই জাতের গাছ বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় কি ক'রে? জীবজন্তুর মত তারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ত' যেতে পারে না! তা' হলে কোনও গাছের বীজ এক জায়গা থেকে অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে কি ক'রে?

এস আমরা তা' দেখি—



শিমুল গাছ তোমরা সকলেই চেনো। কোন কোন জায়গায় ওকে মাদার গাছও বলে। এর গাছের গুঁড়িতে কাঁটা হয়। খুব লাল, বড় বড় ফুল হয়। ফুল শেষ হওয়ার পর দেখা দেয় ফল। চৈত্র-বৈশাখ মাসে এর ফল পেকে ফেটে যায়। তারপর ফল থেকে তুলো বেরিয়ে বাতাসে উড়ে যায় দূর-দূরান্তে। তুলোর সঙ্গে থাকে বীজ। এইভাবে শিমুলের বীজ ছড়িয়ে পড়ে কত কত দূরে বাতাসের সাহায্যে। বাতাসের সাহায্যে আর কোন্ কোন্ গাছের বীজ ছড়ায়?

এস তা' দেখা যাক—

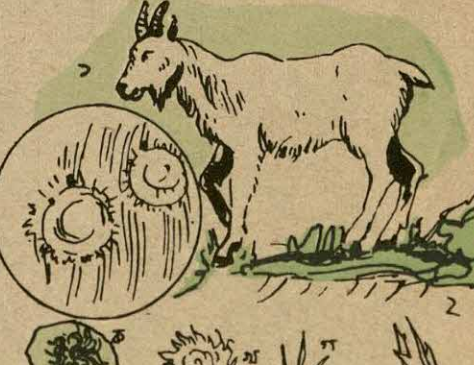


পাশের ছবিতে বিভিন্ন রকমের বীজ দেখানো হ'য়েছে। কোনও বীজের ডানা আছে কি? ছাতার মত কিছু আছে বীজের সঙ্গে লাগানো? এই ধরনের বীজ তোমাদের ইস্কুলের বাগানে বা ইস্কুলের কাছে কোনও পোড়ো জায়গায় আছে কিনা খুঁজে দেখো।

প্রত্যেকটি বীজ তুমি ভালো ক'রে দেখো। বাতাসে ওটা কি ক'রে অন্য জায়গায় ছড়াতে পারে তা' ভেবে দেখো।

আচ্ছা, বাতাস ছাড়া অন্য কোনও উপায়ে কি গাছের বীজ বিভিন্ন জায়গায় ছড়াতে পারে?

এস, আমরা দেখি—



দোপাটি ফুলের বীজ দেখেছ তোমরা। ফুল ঝ'রে যাওয়ার পর সেখানে বীজ হয়। কাঁচা অবস্থায় এই বীজ থাকে সবুজ। একটা আবরণের মধ্যে সাজানো থাকে দোপাটির বীজ। বীজের আবরণটা পাকলে আর সবুজ থাকে না, হলদে মত হ'য়ে যায়। এই সময়ে তুমি যদি সেই আবরণ বা ফলটায় হাত দাও, দেখবে ফট্ করে ওটা ফেটে গিয়ে বীজগুলি ছড়িয়ে যাবে চারদিকে। ঐ আবরণটা তখন বেঁকে গুটিয়ে যাবে। মটর এবং সীমের বীজও ঠিক এইভাবে ফেটে ছড়িয়ে যায়।

টম্যাটো, শশা, পেঁপে, আম প্রভৃতি ফলের বীজের চারদিকে থাকে ফলেরই একটা অংশ জড়ানো। মানুষ, পাখী বা কোন পশুতে এই ফল খায়, তারপর আঠিটা বা বীজগুলি ছুড়ে ফেলে দেয়।

ছবিতে আরও কতকগুলি বীজ দেখো। নীচু জমিতে একরকম খাগড়া গাছ



হয়। তার বীজের সর্বাঙ্গে কাঁটা। গরু-ছাগল প্রভৃতির লোমে সেগুলি আটকে গিয়ে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে।



চোর-কাঁটা দেখেছ তোমরা। মাঠে অজস্র চোর-কাঁটার গাছ হয়। এর বীজে থাকে এক রকম হুল। মাঠ দিয়ে যে যাবে, ঘোড়া, গরু, ছাগল এমন কি মানুষকেও এরা বাদ দেয় না। চোরের মত এই হুল পশুর লোমে, মানুষের কাপড়ে আটকে যায়। এইভাবে এরা দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়ে।

নারকেল প্রভৃতি কতকগুলি ফল জলের সাহায্যে দূর-দূরান্তে চলে যায়। সমুদ্রের ধারেই বেশির ভাগ নারকেল গাছ জন্মে। নারকেল সমুদ্রে পড়ে, তারপর হাজার হাজার মাইল দূরে চলে যায় জলে ভাসতে ভাসতে। অবশেষে তারা কোথায়ও মাটি পেলে সেখানেই অঙ্কুর বের ক'রে গাছ হয়।

কিন্তু সব সময়েই বীজ থেকে যে গাছ হবে এমন কথা নেই। একমাত্র পাকা বীজ যদি উপযুক্ত জায়গায় পড়ে তবেই তার থেকে গাছ হতে পারে। এই উপযুক্ত জায়গা কোন্ ধরনের মাটিতে হয় তা আমরা জানি।



ভিজে কাদামাটিতে হয় ধান। জলটা বর্ষা চলে গেলেই শুকিয়ে যায়। গম অবশ্য উঁচু আর সার দেওয়া জমিতেই ভালো হয়। এজন্য উত্তর প্রদেশের যেসব জমিতে জল দাঁড়ায় না সেখানে হয়। দাক্ষিণাত্যের কালো, সার-জমিতে তুলোর চাষ উপযুক্ত। পাট পশ্চিমবঙ্গের ভিজে জমিতে ভালো হয়।

বিভিন্ন শস্য বিভিন্ন ঋতুতে জন্মে। আমাদের সবচেয়ে দরকারী শস্যগুলি কোন্ কোন্ ঋতুতে হয়?

এস আমরা তা দেখি—



কতকগুলি গাছ ও শস্যের ছবি দেওয়া হ'য়েছে এখানে। এইসব গাছ থেকে আমরা খাদ্য, বস্ত্র ও তক্তার কাঠ পাই। এগুলির জন্য বিভিন্ন জলবায়ু প্রয়োজন। তুমি বলতে পারো এর কোন্ গাছ কোন্ জলবায়ুতে ভালো জন্মে?

একটা তালিকা তৈরী করে তোমার শিক্ষককে দেখাও। তিনি তোমার তালিকা পরীক্ষা ক'রে ব'লে দেবেন তোমার কোন্ কোন্ উত্তর ঠিক হ'য়েছে।

স্বাভাবিকভাবেই শস্যের কতকগুলি শত্রু আছে। এই শত্রু কি কি?



এস, আমরা তা দেখি—

কোনও শস্যক্ষেতে গিয়ে শস্যগাছের পাতাগুলি দেখো। পাতায় কোনও পোকা-মাকড় দেখতে পাচ্ছ? কোনও পাতা খাওয়া ব'লে মনে হ'চ্ছে? পোকা-মাকড় আমাদের শস্যের প্রচুর ক্ষতি করে।

শস্য পাকলে ইঁদুর, গরু-ছাগল ও অন্যান্য পশুতেও তার ক্ষতি করে। এমনকি, শস্য গোলাজাত করার পরও পোকা-মাকড়, ইঁদুর প্রভৃতিতে তা নষ্ট করে।

যেখানে জল লাগবে না, পোকা-মাকড় বা কীট-পতঙ্গ ঢুকতে পারবে না, এমন গোলাতেই শস্য রাখা উচিত।

আমরা কি শিখলাম?

১। গাছ থেকে প্রচুর বীজ পাওয়া যায়।
২। কোনও বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার জন্য চাই—উত্তাপ, আলো, ভিজে মাটি আর বাতাস।
৩। গাছপালা বেড়ে ওঠার জন্য চাই—মাটি, ফাঁকা জায়গা, আর আলো।
৪। কতকগুলি বীজ বাতাসে, কতক জলের সাহায্যে এবং আর কতকগুলি বীজ গোরু-ছাগল প্রভৃতি পশু ও মানুষের সাহায্যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।
৫। বিভিন্ন শস্য তৈরীর জন্য বিভিন্ন রকম অবস্থা চাই।
৬। জল দাঁড়ায় না এমন নরম মাটিতে গম ভালো হয়।
৭। ধান উর্বর ও ভিজে জমিতে ভালো হয়।
৮। নানা রকম পাখী, ইঁদুর প্রভৃতিতে শস্যের ক্ষতি করে।
৯। ইঁদুর ও পোকামাকড়ে শস্যবীজ নষ্ট করে।
১০। বীজগুলিকে এমন জায়গায় জমা রাখা উচিত যেখানে জল পড়ে না বা পোকা-মাকড়, ইঁদুর প্রভৃতিতে অত্যাচার করে না।

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হবে—

প্রত্যেকটি প্রশ্নের তিনটি ক'রে উত্তর দেওয়া আছে। উত্তরগুলির মধ্যে যেটা তোমার সঠিক ব'লে মনে হবে, তার পাশে একটা ক'রে টিক্ মার্ক (✓) দাও—

(ক) গোলাজাত শস্যবীজ শুকিয়ে রাখতে হবে। কারণ—
  (১) ইঁদুরে শুকনো খাওয়া পছন্দ করে না।
  (২) ওগুলি যথেষ্ট জল পায় না।
  (৩) আর্দ্র জলবায়ু বীজগুলিকে গুলিয়ে ফেলতে পারে।

(খ) ঘন জঙ্গলে অনেক চারাগাছ মরে যায়। কারণ,
  (১) তারা যথেষ্ট জায়গা ও আলো পায় না।
  (২) তারা যথেষ্ট জল পায় না।
  (৩) তারা যথেষ্ট বাতাস পায় না।

(গ) ফুটিয়ে নেওয়া ঠাণ্ডা জলে সীমের বীজ অঙ্কুরিত হয় না। কারণ,

(১) জারে কোন মাটি থাকে না।

(২) ফুটিয়ে নেওয়ায় জলের ভিতরকার জীবাণু ম'রে যায়।

(৩) ঐ জলে কোন বাতাস থাকে না।

(ঘ) গাছ থেকে তার বীজগুলি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার দরকার হয়। কারণ,

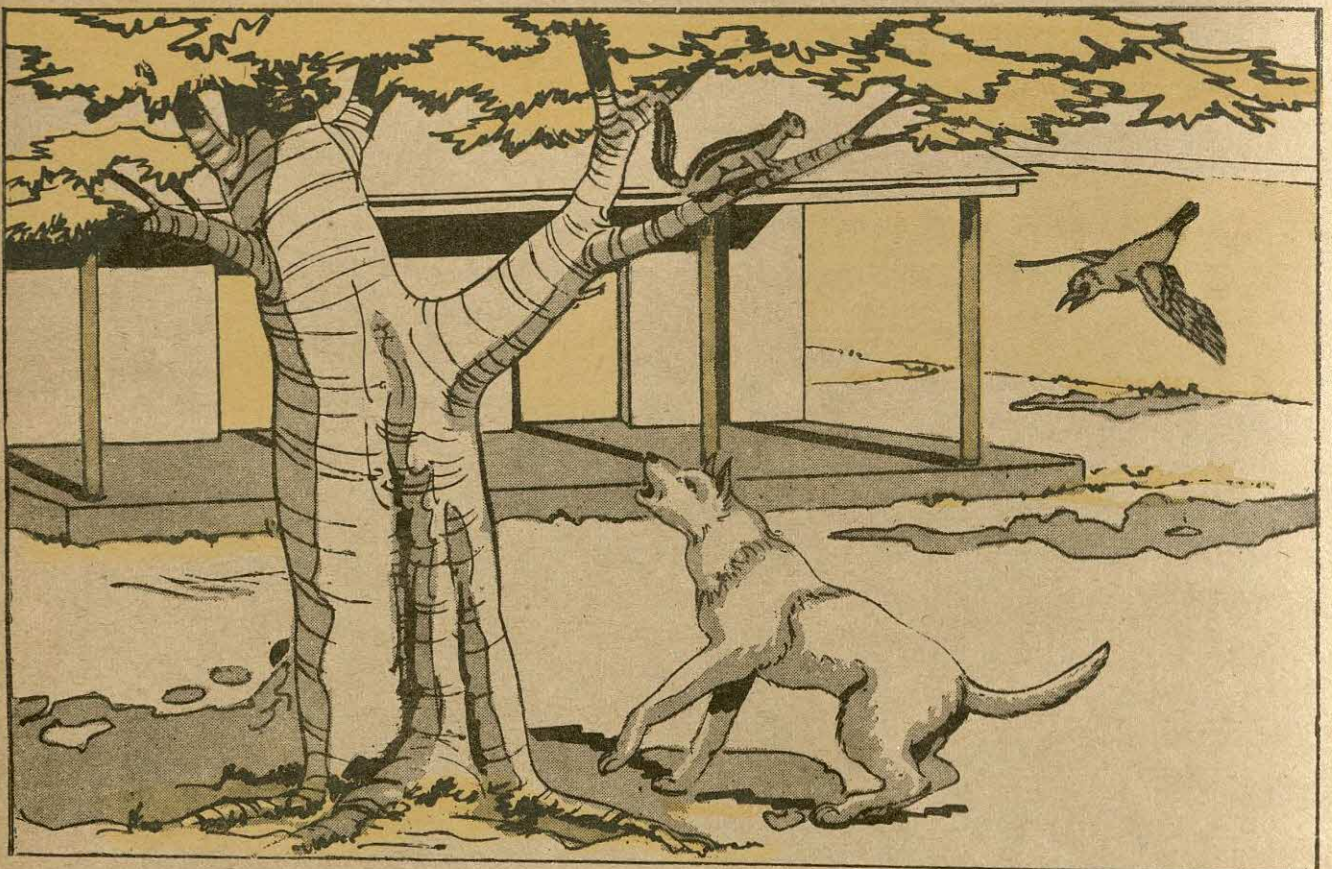
(১) তাদের খাদ্য চাই।

(২) একটা চারাগাছের সঙ্গে আর একটা চারাগাছের জায়গা, আলো ও বাতাস নিয়ে ভীষণ প্রতিযোগিতা চলে।

(৩) গাছগুলির উত্তাপ, খাদ্য ও আশ্রয় নিয়ে খুব প্রতিযোগিতা হ'তে পারে।

২। 'ক' স্তম্ভের বাক্যাংশগুলির সঙ্গে 'খ' স্তম্ভের বাক্যাংশ এমনভাবে জোড়া দাও যাতে একটা উপযুক্ত বাক্য হ'তে পারে—

'ক'	'খ'
(অ) কীটপতঙ্গ, ইঁদুর ও পাখী	(অ) নতুন চারাগাছে জন্মে
(আ) একটা গাছের বীজ থেকে	(আ) জল
(ই) ফুটালে তার ভিতরের বাতাস চলে যায়	(ই) ফলের বীজ ছড়িয়ে দিতে
(ঈ) মানুষ এবং পশুতে সাহায্য করে	(ঈ) বীজের যথেষ্ট ক্ষতি করে।



মনে কর তোমার পোষা কুকুরটা একটা কাঠবিড়ালীকে তাড়া করল। কাঠবিড়ালীটা তাড়া খেয়ে এখানে-ওখানে ছুটাছুটি করবে। তারপর একটা গাছ পেলেই এক দৌড়ে সে উঠবে গিয়ে ঐ গাছের মগডালে। কিন্তু কুকুর ত' আর গাছে উঠতে পারে না! সে ঐ গাছের গোড়ায় ব'সে বড় জোর কিছুক্ষণ ঘেউ ঘেউ করবে, তারপর তাকে হার মেনে ফিরে আসতে হবে। আচ্ছা, বলতে পার, কোন প্রাণী গাছে উঠতে পারে আবার কোন প্রাণী পারে না কেন?

প্রত্যেক প্রাণীই তাদের বিভিন্ন জীবনধারার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয়। কাঠবিড়ালীর বাস হ'চ্ছে গাছে আর কুকুর বাস করে মাটিতে। সেইজন্য কাঠবিড়ালী গাছে উঠতে পারে কিন্তু কুকুর পারে না।

পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ বিভিন্ন ধরনের প্রাণী আছে।

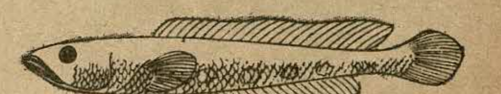
তাদের সকলেই বিভিন্ন জায়গার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয়। খাওয়া, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া এবং চলাফেরার জন্য তাদের দেহে বিশেষ বিশেষ গঠন থাকে। কোন প্রাণী জলে বাস করে, কোন প্রাণী বাস করে ডাঙ্গায়। আর সব গাছে বাস করে।



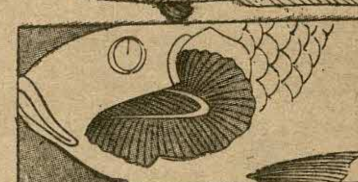
মাছ এবং আরও অনেক প্রাণী কি ক'রে জলে বাস করে?

এস, আমরা তা' দেখি—

নদী বা পুকুর থেকে কয়েকটা মাছ ধরো। সেগুলিকে একটা বড় কাচের জারের মধ্যে জল দিয়ে রেখে দাও। ঐ জারের মধ্যে যখন মাছগুলি সাঁতরায় তখন তাদের দেখো। মাছগুলির কি আমাদের মতো হাত-পা আছে? তার বদলে তাদের কি আছে? তাদের আছে পাখনা আর লেজ। দেখো, তারা কিভাবে সাঁতার কাটার সময় তাদের পাখনা আর লেজ ব্যবহার করে।

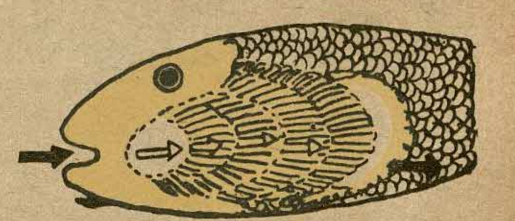


কিন্তু একমাত্র পাখনা আর লেজের জন্যই যে মাছ জলে বাস করতে পারে তা' নয়। মাছ জলের মধ্যে কিভাবে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেয়?



এস, তা' দেখা যাক—

জারের ভিতরের মাছের দিকে আবার তাকাও। প্রত্যেকটি মাছের চোখের পেছনে তলার দিকে একটা লম্বা চেরা দাগ আছে দেখতে পাচ্ছ? এটাকে কান্‌কো বলে। এর ভিতর আছে 'ফুল্‌কো'। ঐ লম্বা চেরা দাগটা হ'চ্ছে কান্‌কো বা 'ফুলকোর' আচ্ছাদনটার পেছনের কিনারা। ঐ কান্‌কোটা নড়ছে দেখতে পাচ্ছ?



ছবিটার দিকে তাকাও। দেখবে, এই কান্‌কোর নীচে আছে ফুল্‌কো। মাছের মুখের ভিতর দিয়ে জল ঐ ফুল্‌কোর উপর দিয়ে কান্‌কোর চেরা জায়গা দিয়ে বেরিয়ে যায়। তার ফলে কান্‌কো, যেটা ফুল্‌কোর ঢাকনী, সেটা ওঠা-নামা করে। ফুল্‌কোর উপর দিয়ে যখন জল যায়, তখন গুলে-যাওয়া অক্সিজেনটা জল থেকে বেরিয়ে আসে। এইভাবে ফুল্‌কোর সাহায্যে মাছ জলের ভিতর থেকে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারে। কিন্তু মাছ জলের ভিতর খায় কি ক'রে?



এস, আমরা তা' দেখি—

কিছু ছোট ছোট পোকা-মাকড় বা ময়লা কুড়িয়ে আনো। ওগুলিকে মাছের জারের মধ্যে ফেলে দাও। পোকা-মাকড়গুলির কি হবে?

খাওয়ার সময় মাছ তার মুখের মধ্যে জল নেয়। এই জলটা আবার ঐ কান্‌কোর



চেরা জায়গা দিয়ে বেরিয়ে যায়। খাদ্যটা পিছনে থেকে যায়। ওটা মাছ গিলে ফেলে।

অন্যান্য আরও অনেক জলজ প্রাণী এইভাবে বাস করে। পুকুর থেকে কতকগুলি বেঙাচি ধরো। ওগুলি কিভাবে সাঁতার কাটে? ওরা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেয় কি ক'রে? খায়ই বা কি ক'রে? ওদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে যত কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে পার তা' করো।



মাছ এবং বেঙাচি ছাড়াও অন্যান্য অনেক প্রাণী জলে বাস করে। পাশের ছবিটির দিকে তাকাও। ওখানে একটি ডুবুরী গুবরে পোকা, মাঝি পোকা এবং পিছন দিকে সাঁতরায় এমন পোকা দেখতে পাবে। এইসব প্রাণী জলের নীচে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয় কি ক'রে?

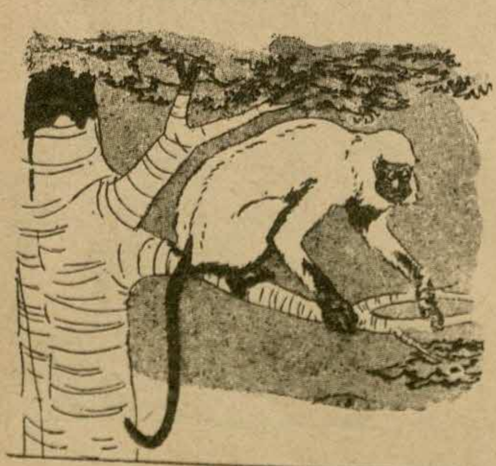
এস আমরা তা' দেখি—



পুকুর থেকে কতকগুলি জলের পোকা ধরো। ওগুলিকে জলভর্তি একটা জারের মধ্যে রাখো। কিভাবে ঐসব পোকা সাঁতার কাটে, কিভাবে নিঃশ্বাস নেয়, কিভাবে খায় তা লক্ষ্য করো। এই পোকাগুলি বারে বারে জলের উপর ভেসে ওঠে কেন। তারা জল থেকে অক্সিজেন নেয়, না বাতাস থেকে?

অধিকাংশ প্রাণীই ডাঙ্গায় বাস করে। কুকুর, বিড়াল, গরু, শুয়ার, ইদুর প্রভৃতি প্রাণী ডাঙ্গার জীব। ডাঙ্গায় বিভিন্ন ধরনের জায়গায় তারা বাস করে। গাছপালায় ভরা অরণ্য আছে, কোথায়ও আছে ঘাসের জমি, গাছপালা সেখানে কমই জন্মে। কোথায়ও আছে বালুকাময় মরুভূমি, কোথায়ও পাহাড়। প্রাণীরা এইসব জায়গায় নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয় কি করে?

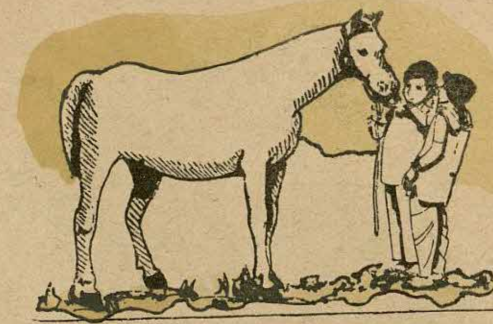
এস, আমরা তা' দেখি—



তোমরা নিশ্চয়ই বানরকে গাছে উঠতে দেখেছ। তাদের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি কিভাবে তাদের গাছে উঠতে, পাহাড়ে বা বাড়ীর ছাদে উঠতে সাহায্য করে? তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি ভালো ক'রে দেখো। তোমাদের আঙ্গুলের মতই কি তাদের আঙ্গুল নয়? তাদের হাত-পা দিয়ে জড়িয়ে ধরে তারা বেশ সহজেই গাছে উঠে যেতে পারে। হাত-পা'র এই রকম গঠনের জন্যই তারা স্বচ্ছন্দে গাছে বা বাড়ীর ছাদে উঠতে পারে। বানরের মত গাছে উঠতে পারে কোন্ কোন্ প্রাণী তাদের একটা তালিকা করো।

বানর, কাঠবিড়ালী, বিড়াল প্রভৃতি প্রাণী শত্রুর তাড়া খেয়ে খুব তাড়াতাড়ি গাছে উঠে যেতে পারে। ডাঙ্গায় যেসব পশু বাস করে তারা শত্রুর কাছ থেকে কি ক'রে পালায়?

তোমরা কখনও গরু, ঘোড়া কি হরিণের পাগুলি ভালো ক'রে দেখেছ? ওদের পা কি বানরের পায়ের মতন? গরু-ঘোড়ার পাগুলি লম্বা ও বেশ দৃঢ়। এই পায়ের সাহায্যে তারা দৌড়ে শত্রুকে হারিয়ে দেয়। যেসব প্রাণী খুব জোরে ছুটতে পারে এই ধরনের পা তাদের কেন দরকার হয়?



এস আমরা তা দেখি—

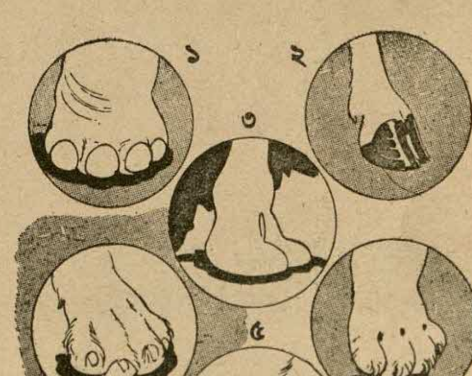
একটা ঘোড়া বা গরুর পায়ের দিকে তাকাও। দেখবে, তাদের ক্ষুর কত শক্ত আর দৃঢ়। এই রকম ক্ষুর তাদের শক্ত মাটি বা পাথরের উপর দিয়ে দৌড়াতে দরকার হয়। হরিণের শক্ত ক্ষুরও তোমরা দেখেছ নিশ্চয়। তাদের শক্ত ক্ষুর আর লম্বা পা খুব জোরে ছুটতে সাহায্য করে। তোমরা খালি পায়ে কখনও শক্ত, পাথুরে জায়গায় দৌড়াতে চেষ্টা করেছ কি? তা' করলে কি হবে? হরিণ কি ক'রে ঐ পথে জোরে ছুটতে পারে?



সমস্ত স্তন্যপায়ী পশুরই কি শক্ত ক্ষুর আছে?

এস, তা' দেখা যাক—

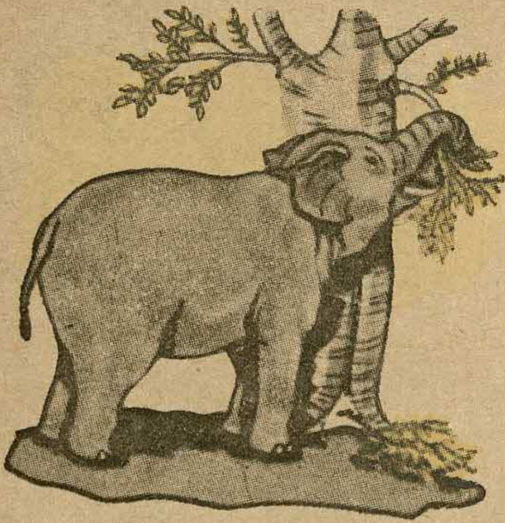
পাশের ছবিটা দেখো। ছবিটায় অনেকগুলি পশুর পা দেখা যাচ্ছে। কোন্ পা কোন্ পশুর বল দেখি।



কোনও প্রাণীর কি খাওয়ার অভ্যাস তা' তার পা দেখে খানিকটা আঁচ করতে পারা যায়। যেসব প্রাণীর গরু-ছাগলের মতো পায়ের ক্ষুর শক্ত, তারা ঘাস ও গাছপালার পাতা খেয়ে থাকে। কিন্তু কুকুর-বিড়াল বা বাঘের মতো যেসব প্রাণীর পায়ে নখ ও নরম গদির মতো আছে তারা? তারা কি খেয়ে থাকে? তারা শিকারই বা ধরে কি করে?

যেসব প্রাণী গাছে বা ডাঙ্গায় বাস করে তাদের কথা আমরা আগে ব'লেছি। ডাঙ্গার প্রাণীদের মধ্যে হাতী একটা অতিকায় জন্তু। এরা গাছের পাতা ও ঘাস খায়। এদের দেহে এমন কি বিশিষ্ট গঠন আছে যার জন্যে এরা লম্বা গাছ থেকেও পাতা খেতে পারে? হাতী জল খায় কি ক'রে?

অনেক ডাঙ্গার প্রাণী মাটির নীচে বাস করে। কেমন ক'রে তারা সেখানে থাকে?



এস আমরা তা দেখি—

কোনও বাগানের মাটি খঁড়ে দেখো। মাটির মধ্যে কোন্ ধরনের প্রাণী দেখতে পাবে? হয়ত কতকগুলি পোকা-মাকড় পাবে। কেঁচো বা শূককীটও দেখতে পাবে। ভাগ্যক্রমে খরগোস, সজারু বা বেজীর গর্তও দেখতে পারো। এইসব প্রাণী মাটির নীচে গর্ত করে বাস করে। তারা সেখানে থাকে কেন?

শুষ্ক ও উত্তপ্ত মরুভূমি অঞ্চলে সাপ প্রভৃতি অনেক প্রাণী মাটির নীচে আত্মরক্ষার জন্য গর্তের মধ্যে বাস করে।

সাপ, কেঁচো প্রভৃতির হাত-পা নেই। তারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় কি ক'রে যায়?



এ ব্যাপারে কিন্তু পাখী, বাদুড় এবং আরও অনেক কীট-পতঙ্গ ভাগ্যবান। খাদ্য অন্বেষণের জন্য তারা ডানার সাহায্যে এখানে-ওখানে যেতে পারে। তোমরা প্রায়ই ফুলবাগানে প্রজাপতি দেখে থাকো। ফুলবাগানে তারা কি করে?

এস, তা' দেখা যাক—

ফুলবাগানের মধ্যে যাও। ফুলের উপর কোথায় প্রজাপতি ব'সে আছে বের করো। সে ফুল থেকে কি নিচ্ছে? ভালোভাবে দেখো। প্রজাপতির লম্বা জিভটা দেখতে পাচ্ছ কি? এটা দিয়ে প্রজাপতি কি করে?


ক



কীট-পতঙ্গ বিভিন্ন রকমে খাদ্য গ্রহণ করে। কি কি বিভিন্ন উপায়ে তারা খায়?

এস, তা' দেখি—

পাশের ছবিটির দিকে তাকাও। এখানে অনেকগুলি বিভিন্ন রকমের কীট-

পতঙ্গ দেখতে পাবে। এদের খাদ্যগ্রহণ প্রণালীও আলাদা। আরশোলা ও ফড়িংয়ের খাদ্যকে কামড়িয়ে চিবোবার জন্য শক্ত চোয়াল আছে। মশা আর ছারপোকার মুখে রক্ত চুষে নেওয়ার ব্যবস্থা আছে। মাছির জিভটা স্পঞ্জের মত নরম। প্রজাপতি আর মৌমাছির আছে লম্বা ও সরু মুখ। এ দিয়ে তারা ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করতে পারে। ছবিতে যে ক'টি কীট-পতঙ্গ আছে তাদের নাম বলতে পার কি না দেখো।

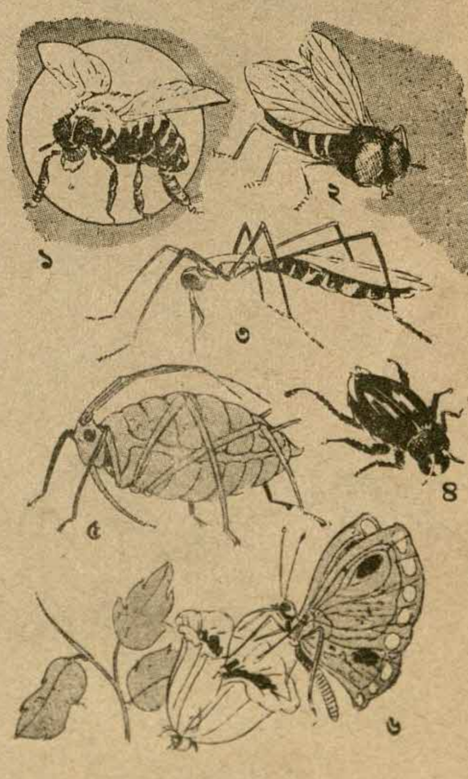


স্তন্যপায়ী জন্তুদের থেকে কীট-পতঙ্গের নিঃশ্বাস নেওয়ার রীতি আলাদা। ওদের বিশেষ ধরনের নিঃশ্বাস নেওয়ার নল আছে। এই নলগুলিতে কীট-পতঙ্গের শরীরের পাশ বরাবর ফাঁক আছে।

তা' আমরা কি ক'রে জানতে পারি?

এস তাও দেখা যাক—

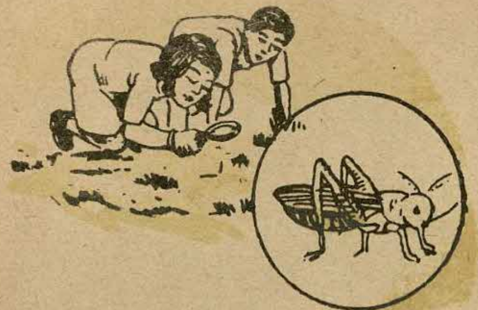
একটা বড় ফড়িং ধরো। একটা হাত-লেন্স্ নিয়ে দেখো ওর নিঃশ্বাস লওয়ার নলের মুখটা দেখতে পাও কিনা। এটা ওর দেহের পাশ বরাবরই থাকে। ফড়িং এই নলের ফাঁক দিয়ে নিঃশ্বাস নেয়।



সমস্ত কীট-পতঙ্গের ছ'খানা করে পা থাকে। এই পায়ের সাহায্যে তারা হাঁটতে বা গাছে উঠতে পারে। অধিকাংশ পোকা-মাকড়ের আবার একজোড়া বা দু'জোড়া করে ডানা থাকে। এর সাহায্যে তারা উড়তেও পারে। পাখীরও উড়বার জন্য ডানা আছে।

লক্ষ লক্ষ বছর আগে আজকালকার পাখীর পূর্বপুরুষ ছিল টিকটিকির মতো প্রাণী। তাদের পা ছিল চারখানা। কালক্রমে সম্মুখের পা দুখানিই ডানায় রূপান্তরিত হ'য়েছে।

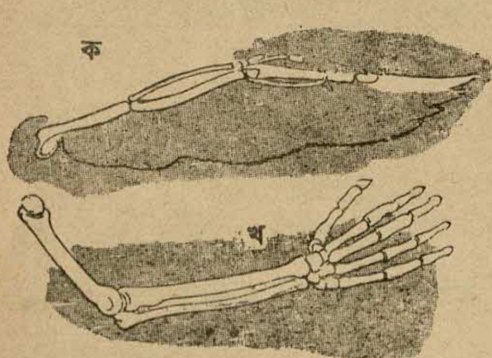
আমরা তা' কি ক'রে জানতে পারি?



এস, তা' দেখি—

পাখীর ডানার হাঁড়গুলি দেখো। একটা বানরের হাতের হাঁড়ের সঙ্গে ঐ পাখীর ডানার হাঁড়গুলির তুলনা করো। ওগুলি একই রকম কিভাবে?

বাদুড়েরও ডানা আছে। তাদের ডানার হাঁড় বানরের হাতের হাঁড়ের মতই বাদুড় কিন্তু পাখী নয়। তারা স্তন্যপায়ী জন্তু। ইঁদুরের সঙ্গে ওদের খুব মিল আছে।



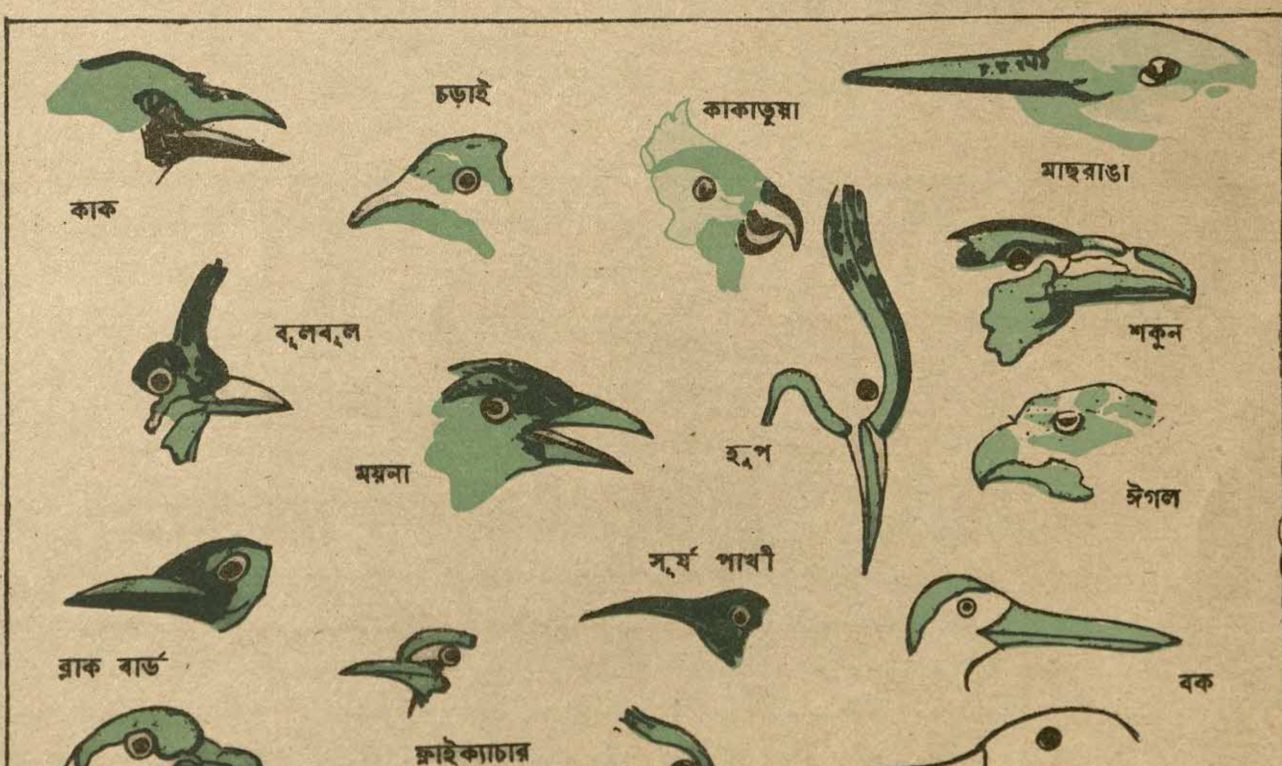
পাখীরা বিভিন্ন রকমে খাদ্য গ্রহণ করে। একটা পাখীর ঠোঁট বিশেষ ক'রে লক্ষ্য করলে আমরা বুঝতে পারি সে কি ক'রে খায়। চড়ুই প্রভৃতি পাখীর ছোট এবং শক্ত ঠোঁট আছে। তারা কোন্ ধরনের খাদ্য খায়? বক এবং সারস পাখীর আছে খুব লম্বা সরু ঠোঁট। এইরকম ঠোঁট থাকার জন্য তাদের খাদ্য সংগ্রহে কি সুবিধা হয়? শকুন ও চিলের আছে শক্ত ও বাঁকানো ঠোঁট। এইসব পাখীর খাদ্য কি? দোয়েল, বুলবুল প্রভৃতি পাখীর মাটি থেকে পোকা খুঁড়ে খাবার জন্যে আছে লম্বা সরু ঠোঁট। কাঠ-ঠোক্‌রা তার খাদ্যের জন্য গাছের বাকল ফুটো করে পোকা ধরে। কাঠ-ঠোক্‌রার ঠোঁটটা কি ধরনের দেখেছো?

পাশের ছবিটা দেখো। ওদের ঠোঁটের সঙ্গে নামের যোগ আছে কিনা বলতে পারো? পাখীদের খাদ্যের সঙ্গে ওদের ঠোঁটের আকৃতির সম্বন্ধ কি?



কতকগুলি প্রাণীকে ভাগ্যবান বলতে হবে। হাঁস, পানকৌড়ি প্রভৃতি পাখী জলে ডুব দিতে পারে, সাঁতার কাটতে পারে, ডাঙ্গায় হাঁটতে পারে, আবার আকাশেও উড়তে পারে। তারা জলে-স্থলে উভয় জায়গা থেকেই আহার পায়। জল ছাড়া তারা অনেকদিন ধ'রে ডাঙ্গাতেও বাস করতে পারে। হাঁস যেখানে বাস করে সে জায়গার সঙ্গে নিজেকে বেশ খাপ খাইয়ে নেয়। সাঁতরানোর জন্য তাদের পায়ের পাতা জোড়া দেওয়া। হাঁসের পালক তেলো হওয়ার জন্য জলে ডুব মারতে কোন অসুবিধা হয় না। উড়বার জন্যও ওদের ডানা আছে।

পাখী তার ডানার সাহায্যে অনেক দূর উড়ে যেতে পারে। শীতকালে সুদূর উত্তরাঞ্চলের কোন কোন জায়গায় এত ঠান্ডা পড়ে যে অনেক পাখীই সেখানে বাস করতে পারে না। সেখানে বেলে হাঁস এবং আরও অন্যান্য পাখী যারা বাস করে, তারা দক্ষিণে অপেক্ষাকৃত কম শীতের জায়গায় তখন চলে আসে। শীতকালে কলকাতার চিড়িয়াখানার হ্রদেও অসংখ্য বিদেশী পাখী এসে আশ্রয় নেয়। একটু গরম পড়তেই তারা আবার নিজের দেশে উড়ে চলে যায়।



আমরা কি শিখলাম?

১। প্রত্যেক প্রাণীই তাদের জীবনযাত্রার ধরনের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেয়।

২। মাছের পাখ্না ও লেজ তাদের জলে সাঁতার কাটতে সাহায্য করে।

৩। ফুল্‌কোর সাহায্যে মাছ এবং অন্যান্য জলচর প্রাণীরা জলের মধ্যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারে।

৪। বানর, হরিণ, পাখী ও পোকা-মাকড় বিভিন্ন জীবনধারার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেয়।

(ক) বানর, কাঠবিড়ালী এবং অন্যান্য প্রাণী যারা গাছে বাস করে, তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গাছে উঠবার উপযুক্ত।

(খ) হরিণ জাতীয় প্রাণীর পা খুব দৃঢ় এবং ক্ষুরও খুব শক্ত। সেইজন্য তারা খুব জোরে ছুটতে পারে।

(গ) হাতীর লম্বা শুঁড় আছে। এই শুঁড় দিয়ে হাতী সহজেই গাছের ডাল ভেঙ্গে পাতা খেতে পারে।

(ঘ) কেঁচো, সাপ প্রভৃতি কতকগুলি সরীসৃপ মাটির নীচে গর্তে বাস করে। তারা মাটির উপর বুকে হেঁটে চলে।

(ঙ) পাখী, বাদুড় এবং অধিকাংশ পোকা-মাকড়েরই ডানা আছে।

(চ) পোকা-মাকড়ের মুখের অংশের গঠনটা তাদের খাদ্য সংগ্রহের অনুকূল হয়।

(ছ) সমস্ত স্তন্যপায়ী জন্তুই তাদের ফুসফুসের সাহায্যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেয়।

(জ) পোকা-মাকড় তাদের দেহের পাশের বিশিষ্ট ধরনের বায়ু-নল দিয়ে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেয়।

(ঝ) পাখীর বিভিন্ন ধরনের ঠোঁট তাদের বিভিন্ন খাদ্য জোগাড়ে সাহায্য করে।

(ঞ) অনেক পাখী যেখানে বাস করে সেখানে অত্যধিক ঠান্ডা পড়লে অন্য দেশে চলে যায়।

প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হবে—

১। প্রত্যেক প্রশ্নের তিনটি ক'রে উত্তর দেওয়া আছে। উত্তর তিনটির যেটি তোমার সঠিক মনে হবে তার পাশে একটা করে টিক মার্ক বসাও।

(ক) মাছ এবং বেঙাচি জলে বাস করে, কারণ—

(১) তাদের অন্য কোথাও বাস করবার জায়গা নেই।

(২) তাদের গঠন অনুসারে জলেই তারা অভ্যস্ত। জলেই তারা চলাফেরা করতে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিতে এবং খাদ্যগ্রহণ করতে পারে।

(৩) পান করবার জন্য তাদের প্রচুর জল লাগে।

(খ) পোকা-মাকড় কোন্ ধরনের খাদ্য খায় তা' কি ক'রে অনুমান করা যায়?

(১) ওর পায়ের দিকে তাকিয়ে ওটা গাছে উঠতে পারে কিনা, লাফাতে অথবা খাবার ধরবার জন্যে দৌড়তে পারে কিনা তাই দেখে।

(২) ওর ডানার দিকে তাকালে দেখা যাবে ওর খাদ্যটা ধরতে কোথায় সে উড়ে যায়।

(৩) ওর মুখের গড়নটা দেখে।

(গ) মরুভূমি অঞ্চলে অনেক প্রাণী দিনের বেলায় মাটির নীচে গর্তে বাস করে। তারা এইজন্য বাস করে যাতে—

(১) মাটি থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে।

(২) সূর্যের অত্যধিক উত্তাপ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে।

(৩) একটা জায়গায় বাস করতে হবে, তাই করে।

২। 'ক' স্তম্ভের বাক্যাংশের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভের বাক্যাংশ এমনভাবে মিলিয়ে দাও যাতে একটা নির্ভুল বাক্য হয়।

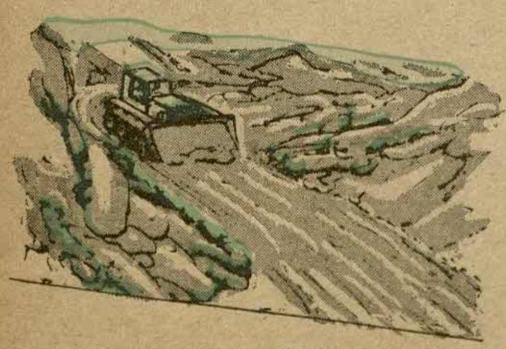
'ক'	'খ'
(অ) স্তন্যপায়ী ডাঙার পশু শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়	(অ) দেহের পাশের ফাঁক দিয়ে
(আ) হাতী গাছের পাতা খায়	(আ) তাদের পাকানো জিহ্বার সাহায্যে
(ই) পোকা-মাকড় শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়	(ই) তাদের ফুসফুসের সাহায্যে
(ঈ) প্রজাপতি ফুল থেকে মধু চুষে নেয়	(ঈ) তাদের শুঁড়ের সাহায্যে

যা করতে হবে—

১। তোমার আশেপাশের জন্তুদের ভালো ক'রে দেখো। তারা যেখানে বাস করে সেখানে বিশেষভাবে কি ক'রে মানিয়ে চলে তা জানো।



অনেক শতাব্দী ধ'রে মানুষ যে পৃথিবীতে বাস করে তার ধরনটা পাল্টিয়ে দিচ্ছে। এমন কি, প্রাচীন যুগেও নদীতে বাঁধ দিয়ে জল সরবরাহ বা জমিতে জল দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। জঙ্গল কেটে বা পুড়িয়ে দিয়ে কৃষির জায়গা করা হ'ত। জাহাজ, ঘরবাড়ী তৈরী ও অন্যান্য কাজের জন্য বড় বড় গাছ কাটা হ'ত।



গত পঞ্চাশ বছর ধরে এই ধরনের কাজ দেশের শিল্প গ'ড়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠেছে। বিরাট যন্ত্রের সাহায্যে পাহাড় কেটে পথ-ঘাট, বিমানঘাটি এবং রেলের লাইন তৈরী হ'য়েছে।

কলকারখানা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। সেখানে কাজ করবার জন্য গাঁয়ের লোক সব ক্রমেই শহরের দিকে ছুটছে। এর ফলে অনেক সমস্যাও দেখা দিচ্ছে। মোটর গাড়ীর বিষাক্ত ধোঁয়া আবহাওয়াকে দূষিত করছে। রাস্তায় জঞ্জাল জমা হ'য়ে লোকের স্বাস্থ্যহানি করছে। মল-মূত্র দূরে সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা রাখতে

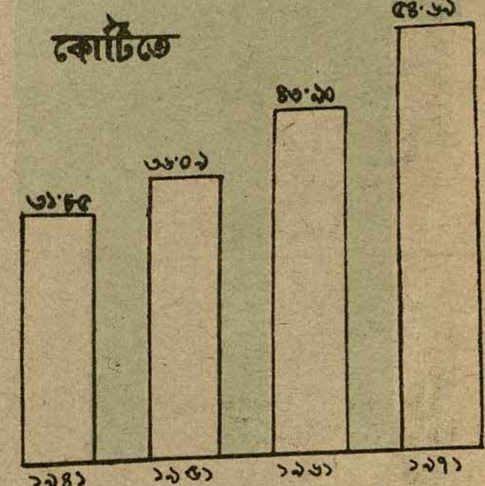
হবে যাতে শহর অস্বাস্থ্যকর না হয়। লক্ষ-লক্ষ লোক শহরে এসে জমা হ'চ্ছে, ফলে আবহাওয়া দূষিত হওয়ার সমস্যা আরও বেশী ক'রে দেখা দিচ্ছে। কলকারখানার ধোঁয়ায় বাতাস দূষিত হ'চ্ছে। মলমূত্র নদীতে গিয়ে জল রোগ-জীবাণুতে পূর্ণ করছে। কারখানার রাসায়নিক পরিত্যক্ত জিনিষও স্বাস্থ্যের হানি ঘটাচ্ছে।



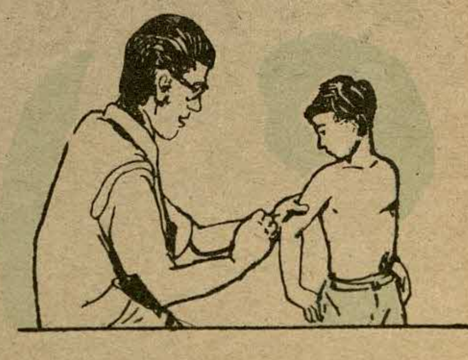
এমন কি, যে সমুদ্র এতদিন মানুষকে মাছ ও অন্যান্য খাদ্য দিয়ে এসেছে, সেই সমুদ্রজলও দূষিত হ'তে চলেছে; প্রতিদিন কলকারখানার ও শহরের প্রচুর দূষিত জল নদীতে গিয়ে পড়ছে এবং এই নদীর জলই আবার পড়ছে গিয়ে সমুদ্রে। আমরা যদি সাবধান না হই, তাহ'লে সমুদ্রজলও ক্রমে দূষিত হ'য়ে যাবে। তখন সামুদ্রিক মাছ বা অন্য কিছু খাওয়া নিরাপদ হবে না।



আমাদের পাহাড় অঞ্চলগুলির বন কেটে ফেলা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। বনের বাধা না পাওয়ায় প্রচুর বৃষ্টি গড়িয়ে আসছে। তার ফলে মাটি ধুয়ে নিয়ে আসছে নদীতে। বন্যাও দেখা দিচ্ছে। বন্যার ফলে সমস্ত দেশেই শস্যের ক্ষতি হ'চ্ছে, ঘরবাড়ীও নষ্ট হ'চ্ছে।



প্রকৃতিকে আয়ত্তে আনবার জন্য নদীগুলির উপর ক্রমেই বেশী করে বাঁধ দেওয়া হ'চ্ছে। এইভাবে নদীতে বাঁধ দিয়ে আমরা জল-বিদ্যুৎ তৈরী ক'রে কলকারখানা চালাই ও বাড়ীতে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালি। এর থেকে ক্ষেতে জল দিই ও শহরে জল সরবরাহ করি। এইসব বাঁধ দিয়ে নদীর জলধারাকে আয়ত্তে আনা যায়। এজন্য নদীতে বন্যাও আসতে পারে না। শস্যক্ষেতের জল পাওয়ার সঙ্গে আরও অধিক পরিমাণ জমি চাষ করা যেতে পারে। তা হ'লে আমাদের জনসংখ্যা যে ক্রমেই বেড়ে চলেছে, তাদের খাদ্য সংকুলানও কিছুটা হ'তে পারে।

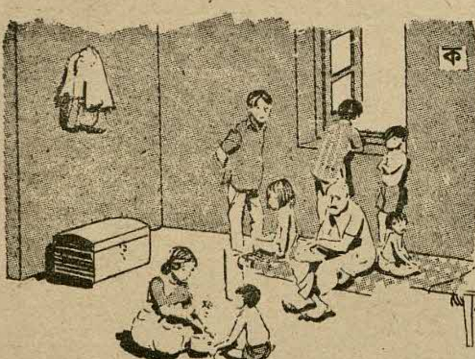


আমাদের দেশের জনসংখ্যা ১৯৪১ সালে যা ছিল, তার প্রায় দ্বিগুণ হ'য়ে গিয়েছে। আর পঞ্চাশ বছর পরে হয়ত চারগুণ হ'য়ে যেতে পারে।

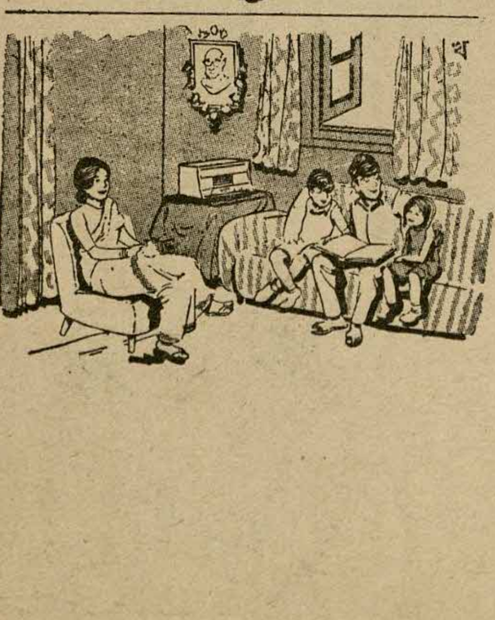


চিকিৎসা বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হওয়ার ফলে মানুষ আর খুব রোগাক্রান্ত হ'চ্ছে না। টিকে, ইনজেকসন, নানা রকম ব্যাধির ওষুধ আবিষ্কার হ'য়েছে। আমরা ভালো খাদ্য পাচ্ছি, ভালোভাবে বাস করতে পারছি। বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা দুর্ভিক্ষ ও মহামারীকে আয়ত্তে এনেছি।

বিজ্ঞানের সাহায্যে এখন আমরা পরিবার পরিকল্পনা ক'রে নিতে পারি। আগেকার দিনে লোকের আট-দশটি ছেলেমেয়ে হ'ত। তাদের অনেকগুলিই মারা যেত। এখন কিন্তু অতো বেশী সন্তান মাতাপিতার সমস্যার বিষয়।



সেইজন্য তারা অল্পসংখ্যক সন্তান চান। সন্তানও তাতে সুখে-স্বাচ্ছন্দে বড় হ'তে পারে। প্রত্যেকেই তা হ'লে উপযুক্ত খাদ্য ও বাসস্থান পেতে পারে। সন্তানেরা বড় হ'লে তাদের কাজকর্মের জন্য তা হ'লে প্রতিযোগিতায় আসতে হয় না। সকলেই সুখী হয়।

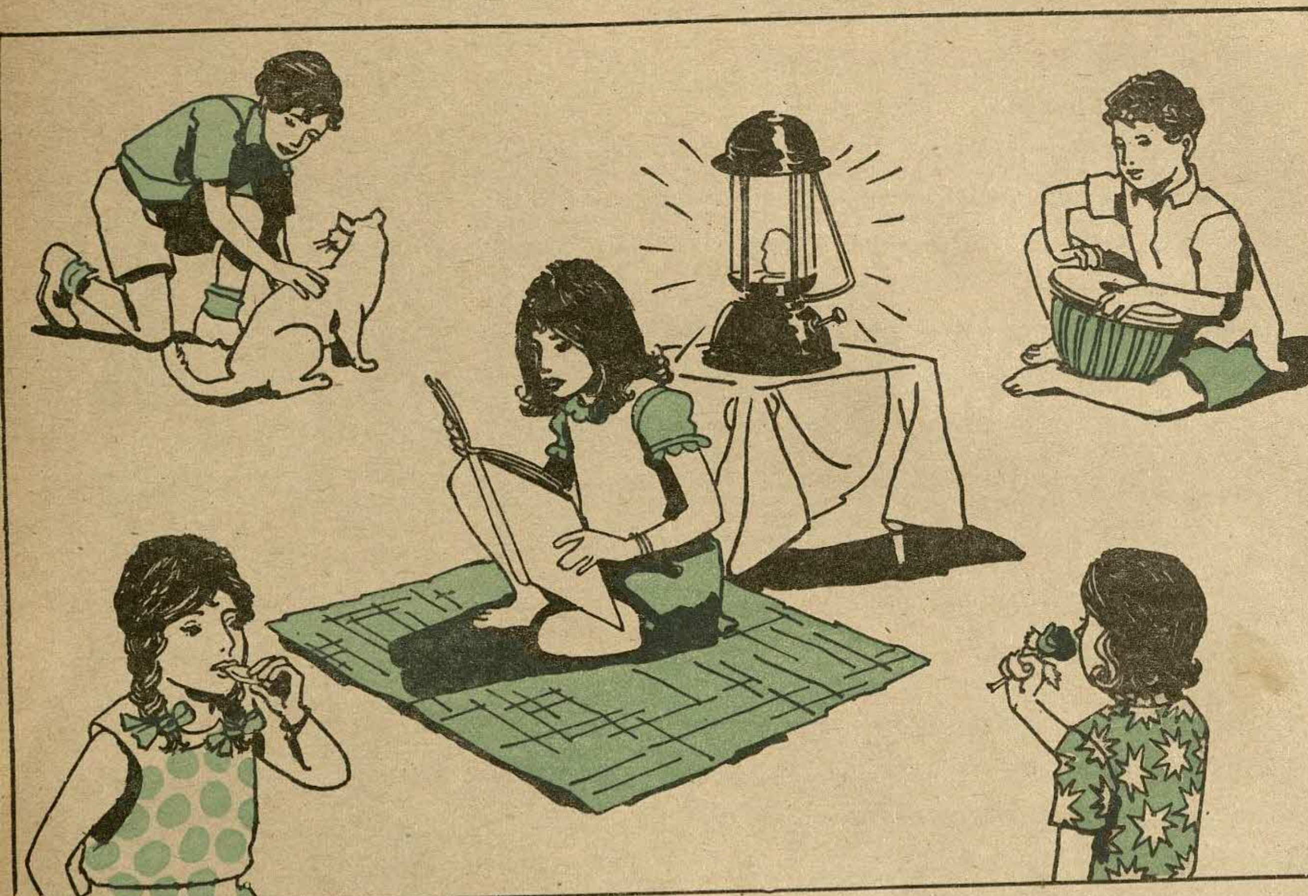


আমরা কি শিখলাম?

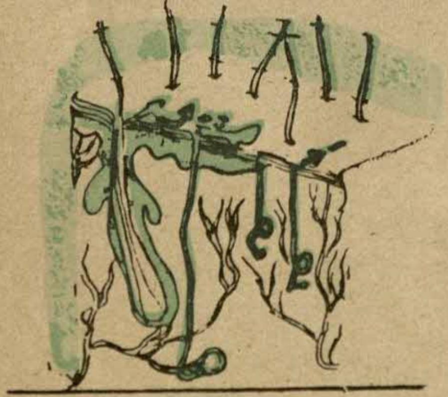
১। অনেক শতাব্দী ধ'রে মানুষ পৃথিবীতে পরিবর্তন নিয়ে আসছে।
২। এই পরিবর্তন বিজ্ঞান আর শিল্পের দ্বারা অগ্রগতি পেয়েছে।
৩। শিল্পের উন্নতির ফলে অনেক শহর গড়ে উঠেছে।
৪। গাঁয়ের লোক কাজ করবার জন্য শহরে ছুটেছে।
৫। কলকারখানার পরিত্যক্ত জিনিষ ও শহরের জঞ্জাল আমাদের জলকে দূষিত করছে।
৬। কলকারখানা ও মোটর গাড়ীর বিষাক্ত ধোঁয়া আবহাওয়াকে দূষিত করছে।
৭। বন কেটে ফেলবার জন্য পাহাড় অঞ্চলে বৃষ্টির ধারা নেমে উর্বর মাটি সরিয়ে নিচ্ছে ও বন্যা হ'চ্ছে।
৮। চিকিৎসা বিজ্ঞান আমাদের অনেক ব্যাধির হাত থেকে বাঁচিয়ে দিচ্ছে।
৯। ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত না হওয়ায় গত পঁচিশ বছরে আমাদের জনসংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণ হ'য়েছে।
১০। আমাদের জনসংখ্যা কমাবার জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ করা একান্ত প্রয়োজন।

প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হবে—

১। বিদ্যালয়ের চারদিক কি ক'রে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা যায় তার পাঁচটা উপায় নির্দেশ কর।
২। কোন্ কোন্ কারণে তোমার বাসস্থানের চারদিকের আবহাওয়া দূষিত হতে পারে মনে কর?
৩। এই দূষিত আবহাওয়া কি করে নষ্ট করা যায় তার উপায় বলতে পার?
৪। দশ বছর আগে তোমাদের গ্রাম বা শহরের লোকসংখ্যা কত ছিল জেনে নাও। বর্তমান লোকসংখ্যার সঙ্গে তার তুলনা করো।
৫। তোমাদের বাসস্থানের ধারেকাছে কতগুলি কারখানা আছে? প্রত্যেকটি কারখানায় কি কি তৈরী হয় তার খোঁজ নাও।



হঠাৎ কোন গরম জিনিষে তোমার হাত লাগলে সঙ্গে সঙ্গেই তুমি হাতটা সরিয়ে নাও। সেজন্য তোমাকে কিছু ভাবতে হয় না। কেন তুমি হাতটা সরিয়ে নাও? কারণ তোমার চামড়া উত্তাপ, ঠান্ডা, ব্যথা ও স্পর্শের অনুভূতি পায়। কি ক'রে পায়?

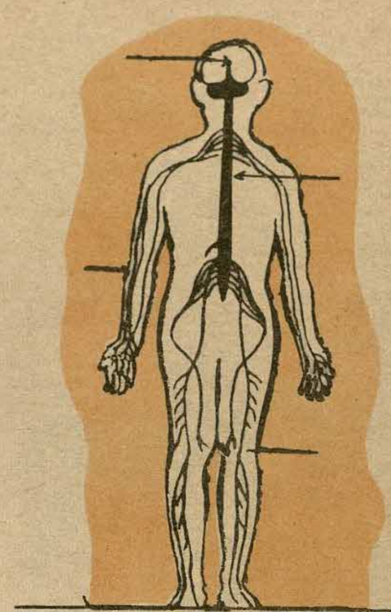


এস, আমরা তা' দেখি—

পাশের ছবিটার দিকে তাকাও। এটা মানুষের চামড়ার একটা অংশ। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলে চামড়াটা এই রকম দেখায়। চামড়ার গঠনটা বড় জটিল। বিশেষ লক্ষ্য করলে তুমি দেখতে পাবে, পাতলা চামড়াটা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ুর জালে ছাওয়া। এইসব স্নায়ুর প্রান্তভাগের সাহায্যে চমাড়াটা অনুভূতিশীল হয়।

দেহের সব অংশেই স্নায়ু আছে। তারা আমাদের হৃদপিন্ড ও ফুসফুসেও

আছে। দেহের সমস্ত যন্ত্রেই তারা বর্তমান। দেহযন্ত্রের প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা কাজ আছে। পাকস্থলী ও তলপেট আমাদের খাদ্য পরিপাক করায়। ফুসফুস ও নাসারন্ধ্র দিয়ে আমরা শ্বাস-প্রশ্বাস নিই। বিভিন্ন দেহযন্ত্রের বিভিন্ন কাজ থাকলেও সমস্ত যন্ত্রের কার্যসমষ্টি নিয়ে দেহ একক। বিভিন্ন দেহযন্ত্র কি ক'রে একসংগে কাজ করে?



এস, আমরা তা' দেখি—

পাশের ছবিখানির দিকে তাকাও। এটা মনুষ্যদেহের স্নায়ুতন্ত্রের ছবি। এই স্নায়ুতন্ত্রে মস্তিষ্ক, মেরুদণ্ড এবং বহুসংখ্যক স্নায়ু আছে। এই স্নায়ুতন্ত্রের অধীন হ'চ্ছে দেহের সমস্ত কার্যকলাপ।

স্নায়ুর বিভিন্ন কাজ আছে। কোন্ কোন্ স্নায়ু আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিটাকে মস্তিষ্কে পেঁাছিয়ে দেয়। এদের বলা হয় অনুভূতিবাহী স্নায়ু। এই স্নায়ু কিভাবে কাজ করে?

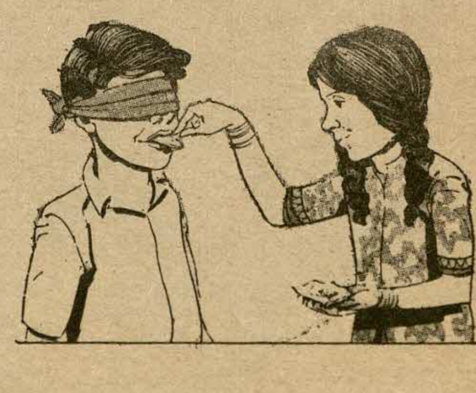
এস, তাও দেখা যাক—



তোমার বন্ধুর চোখ দুটো বন্ধ ক'রে দাও। এবার তার হাতের তালুতে একটা মুদ্রা রাখো। তাকে জিজ্ঞাসা কর ওটা কি। সে কি মুদ্রাটি দেখতে পাচ্ছে? তা হ'লে কি ক'রে সে বলল ওটা কোন মুদ্রা? সে স্পর্শ ক'রে ওটা বুঝতে পারল। তার হাতের অনুভূতিবাহী স্নায়ু খবরটা মস্তিষ্কে পেঁাছে দেবে। মস্তিষ্ক তাকে ব'লে দেবে ওটা কি। মুদ্রাটি না দেখেই সে ওটা কি তা' ব'লে দিতে পারবে।

অনুভূতিবাহী স্নায়ু ইন্দ্রিয়ের কাছ থেকে খবরটা নিয়ে সংগে সংগে মস্তিষ্কে পেঁাছিয়ে দেয়। ইন্দ্রিয়গুলি কিভাবে কাজ করে?

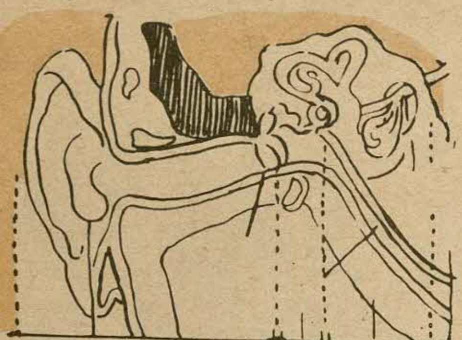
এস, আমরা তা' দেখি—



আর একবার তোমার বন্ধুর চোখ বেঁধে দাও। তাকে জিভ বের করতে বলো। এবার জিভের উপর কয়েকটা চিনির কণা ছড়িয়ে দাও। তার কি মনে হ'ল জিজ্ঞাসা করো। সে কি ক'রে জানলো যে ওটা চিনি?

আমাদের জিহ্বার উপর অনেকগুলি আস্বাদ-মুকুল আছে। এই মুকুলে আছে অনুভূতিবাহী স্নায়ু। এগুলি আমাদের বিভিন্ন খাদ্যের আস্বাদটা জানিয়ে দেয়।

জিহ্বা দ্বারা আমরা আস্বাদ জানি। ত্বক বা চামড়া দ্বারা আমরা গরম-ঠাণ্ডা-ব্যথা প্রভৃতি অনুভব করি। কিন্তু আমরা শুনি কি ক'রে?



এস, তা' দেখা যাক—

তোমার কোন বন্ধুর কানের দিকে তাকাও। কানের যে অংশটা তুমি দেখতে পাচ্ছ ওটা কানের বাইরের অংশ। ওর আর একটা অংশও আছে যেটা দেখা যায় না। পাশে যে ছবিটা দেখছ, ওটা কানের যে অংশটা দেখা যায় না তার ছবি। কানের বাইরের ও ভিতরের অংশের মাঝখানে থাকে কর্ণপটহ। ঢাকে যেমন আঘাত দিলে শব্দ হয়, এই কর্ণপটহে তেমনি বাতাসের আঘাতে শব্দ হয়। বিশেষ ধরনের স্নায়ু এই শব্দ বহন ক'রে পৌঁছিয়ে দেয় মস্তিষ্কে।



চোখের বিশেষ ধরনের স্নায়ু আছে। এগুলি চোখ যা দেখল তার খবর নিয়ে যায় মস্তিষ্কে।

অনুভূতিবাহী স্নায়ুই সব নয়। এগুলি খবরটা পৌঁছে দেয় মস্তিষ্কে। মস্তিষ্ক তখন কি করে? মস্তিষ্ক তখন আর এক ধরনের স্নায়ুকে হুকুম করে। এইসব স্নায়ুকে বলা হয় হুকুমবাহী স্নায়ু বা 'মোটর নার্ভ'। মস্তিষ্কের হুকুম পাওয়া মাত্র এই পেয়াদাস্নায়ু হুকুমটা মাংসপেশীতে নিয়ে যায়। অনুভূতিবাহী স্নায়ু (সেনসরি নার্ভ) ও হুকুমবাহী স্নায়ু (মোটর নার্ভ) কি ক'রে একসঙ্গে কাজ করে?



এস, তাও দেখা যাক—

তোমাকে একখানা লুডো খেলার ঘরের ছবি দেওয়া হ'ল। তুমি ছকটা দেখে নিয়ে একটা কাগজ কেটে বর্গাকার করে নিয়ে ঐ রকম লুডোর ছক তৈরী করলে। কি ক'রে সব ব্যাপারটা ঘটে গেল বল তো?



তোমার চোখের স্নায়ুগুলো মস্তিষ্ককে জানিয়ে দিল খেলার ঐ ছকটা কি আকারের হবে। মস্তিষ্ক সঙ্গে সঙ্গে তার আজ্ঞাবাহী পেয়াদা স্নায়ুকে হুকুম করল হাতের পেশীকে ঐ আকারে কাগজ কাটতে। হাত তাই করল।

দেহের কাজকর্মের জন্য অনুভূতিবাহী স্নায়ুর খুবই দরকার। চোখ-কান-নাক-জিভ-চামড়া এই ইন্দ্রিয়গুলি দিয়ে আমরা বাইরের অনুভূতি জানি। কাজেই ঐ ইন্দ্রিয়গুলির যত্ন নেওয়া দরকার। যাতে ওগুলির কোন ব্যাধি না হয় সেদিকে নজর রাখা খুবই দরকার। চোখের যত্ন কিভাবে নেওয়া যায়?

এস, তা' দেখি—

খুব অল্প আলোয় পড়তে চেষ্টা করো। ঠিক ঠিক মতো তুমি পড়তে পারছ কি? চোখে জোর লাগছে না? হাঁ, অল্প আলোতে পড়তে গেলে চোখে খুব চাপ লাগে। পড়বার সময় সেজন্য উপযুক্ত আলো থাকা উচিত। বইটা কি তুমি চোখের খুব কাছে নিয়ে পড়ো? এতেও চোখে চোট লাগে। ভালোভাবে পড়তে শিখলে চোখে চোট লাগে না। আর কিভাবে চোখকে রক্ষা করা যায়?



এস, তা' দেখা যাক—

তোমার বন্ধুর মুখের উপর টর্চের আলো ফেলো। চোখের উপর তীব্র আলো পড়লে বন্ধুটি কি ভালোভাবে তাকাতে পারবে? অস্বস্তি বোধ করে সে হয়ত চোখ পিট পিট ক'রে তাকাবে। হঠাৎ চোখে উজ্জ্বল আলো পড়লে লোকে চোখ পিট পিট করে কেন? তার কারণ, চোখ হঠাৎ ঐ তীব্র আলোর সংগে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে না। খুব তীব্র আলো চোখের পক্ষে ক্ষতিকারক। তখন চোখের পাতা আপনা থেকেই বন্ধ হ'য়ে যায়। এজন্য খুব তীব্র আলোও এড়িয়ে চলতে হবে। আর কিসে চোখের ক্ষতি করে?



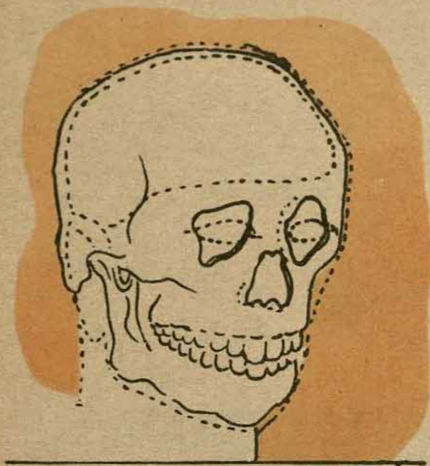


এস আমরা তা জেনে নিই—

কারও চোখ উঠতে দেখেছ? চোখ দুটো লাল হ'য়ে যায়, ব্যথা হয় আর জল পড়ে। একরকম জীবাণুতে এটা করে। জীবাণু থেকে সাবধানে থাকবে। এই অধ্যায়ের শেষে স্বাস্থ্যবিধির কতকগুলি নিয়ম-তালিকা আছে। ওগুলি তোমার মেনে চলা উচিত। কেবল জীবাণুই নয়, কোন রকম আঘাত যাতে চোখে না লাগে তাও তোমাকে দেখতে হবে।



পাশের ছবিতে বালকটির চোখ দুটি দেখো। কি দেখছো? ওর একটা চোখ ফুটে উঠেছে। কি ক'রে ওটা হ'লো? চোখের চারদিকে যেসব স্নায়ু আছে সেগুলি খুব নরম। জোর আঘাত লাগলে চোখে এরকম হ'তে পারে। অনেক সময় তাতে চোখটা নষ্ট হ'য়েও যায়।



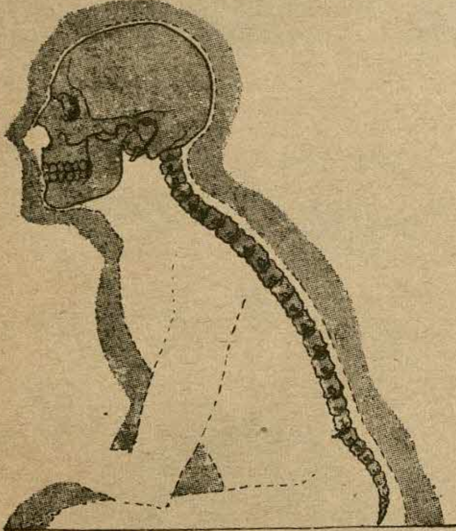
চোখের মতো নাক-কানকেও সাবধানে রক্ষা করতে হবে। নাক-কান পরিষ্কার রাখা উচিত। কানে কখনও সরু কোন কাঠি ঢোকাতে নেই। তাতে কানের পর্দা নষ্ট হ'য়ে যেতে পারে। কানে কোনও ব্যথা হ'লে ডাক্তার দেখানো উচিত।

বাইরের থেকে আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় অনুভূতি পায়। আমাদের মস্তিষ্ক ও স্নায়ুরজ্জু আমাদের এই অনুভূতিতে সাড়া দিতে সাহায্য করে। এগুলিকেও সযত্নে রক্ষা করা দরকার। কিভাবে ঐ দু'টি রক্ষা করা হয়?

এস, তা' দেখা যাক—

তোমার মাথায় হাত দিয়ে দেখো। ওটা শক্ত নয় কি? মাথার খুলির হাড়ের জন্যই ওটা শক্ত। মাথার খুলির হাড় থেকেই মাথার ও মুখের গঠন তৈরী হয়। মস্তিষ্ক, চোখ, কান ও নাক এই খুলির হাড়ে রক্ষা পায়। স্নায়ুরজ্জুটি ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায় কি ক'রে?

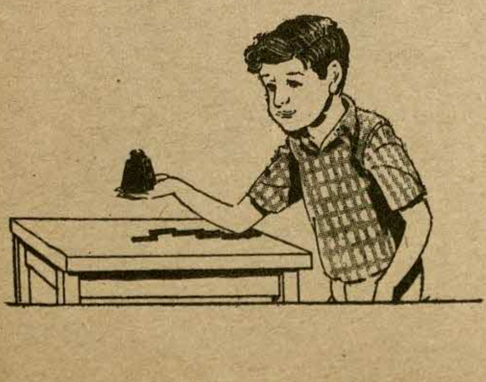
এস তা'ও দেখা যাক—



তোমার হাতটা তোমার বন্ধুর পিঠের মাঝখানটা দিয়ে টেনে নাও। দেখবে বরাবর একটা শক্ত হাড়ের মত নীচের দিকে চলে গেছে। ওটা কি সমতল? না, মার্বেলের মতন গোল, শক্ত হাড়ের মালার মতন?

পাশেই শিরদাঁড়া বা মেরুদণ্ডের ছবি দেখতে পাচ্ছ। অনেকগুলো হাড় দিয়ে ওটা তৈরী। স্নায়ুরজ্জুটা এই শক্ত হাড়ের শিরদাঁড়ার মধ্যে থাকে। ছবিতে দেখানো হ'চ্ছে, কি ক'রে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুরজ্জু মাথার খুলি ও শিরদাঁড়া দ্বারা রক্ষা পায়। পাঁজরার হাড় দিয়ে দেহের কোন্ যন্ত্র রক্ষা পায় বলতে পার? হাড়ের সাহায্যে দেহের গঠনটা তৈরী হয়। কতগুলি হাড় পাতলা ও নরম যন্ত্রগুলিকে রক্ষা করে। আর কোন্ দিক দিয়ে হাড় আমাদের উপকারে আসে?

এস, তা' দেখা যাক—



তোমার ডান হাতটা টেবিলের উপর রাখো। হাতের তালুটা থাকবে উপর দিকে। এবার হাতটাকে তোমার দিকে তুলে নাও। কিসে তোমার হাতটা তুলল? বাহুর কোন্ জায়গাটা বে'কে গেল?

তোমার বাহুর উপর অংশ এবং নীচের অংশ অর্থাৎ হাতটা শক্ত ক'রে আঁটা নেই। কনুই-এর কাছে উঠা-নামা করতে পারে এই দুটো অংশ। অধিকাংশ হাড়ই এমনভাবে জোড়া আছে যাতে তারা এদিক-ওদিক করতে পারে। আমাদের দেহের হাড়গুলিতে বিভিন্ন রকমের সংযোগ আছে। কোন্ ধরনের জোড় আছে দেহের ভিতর?

এস, তা' দেখা যাক—



তোমার বাহুটা সম্মুখ ও পিছনে, উপর ও নীচে নাও। আর কোন্ দিকে তুমি তোমার বাহুটা ঘোরাতে পারো? তোমার কাঁধের চারদিকে বিভিন্নভাবে তোমার বাহুটা ঘোরাতে পারো। কনুইয়ের কাছেও কি ঐভাবে ঘোরানো যায়?

কোন কোন জোড়ের জায়গায় অন্য জোড়ের চেয়ে বেশী ঘুরানো-ফিরানো যায়। পাশের ছবিতে বিভিন্ন রকমের জোড় দেখানো হয়েছে। কত রকমের জোড় তার একটা তালিকা তৈরী কর। সেগুলি কোন্ জায়গায় আছে তারও উল্লেখ

জোড়ের জন্য দেহের নড়ন-চড়ন সম্ভব হয়। কিন্তু একমাত্র হাড় থাকলে দেহের নড়াচড়া করা চলত না। আমাদের মাংসপেশীও আমাদের সাহায্য করে। যখন তোমার হাতটা ঘুরাও তখন বাহুর পেশীতে কি হয়?

এস তা' দেখা যাক—



তোমার হাতটাকে মুঠো করো। এবার তোমার বাহুটা কনুইয়ের কাছে বাঁকাও। কনুইয়ের উপর হাতের পেশীটা টিপে দেখো। ওটা শক্ত না নরম? এরপর তোমার মুঠোটা খুলে দিয়ে হাতটা টেবিলের উপর রাখো। এবার পেশীটার কি অবস্থা হ'ল? ওটা এখন শক্ত না নরম?

যখন তুমি তোমার বাহুটা বাঁকাও তখন কনুইয়ের উপর দিকে হাতের পেশীটা সংকুচিত হয়। এইজন্যই তখন ওটা মোটা আর শক্ত হয়। যখন হাতখানা ছড়িয়ে দাও, তখন ঐ পেশীটা আলগা হ'য়ে যায়। হাতের নড়াচড়ার ব্যাপারে বাহুর অন্য পেশী কি করে?

আমাদের দেহের কোন কোন পেশী আমাদের ইচ্ছামত সংকুচিত বা প্রসারিত হ'তে পারে। আর কতকগুলি পেশী আছে যাদের সম্বন্ধে কোন কিছু না ভাবলেও তারা কাজ করে যায়। আমাদের ইচ্ছামত কোন্ কোন্ পেশী কাজ করে আর ইচ্ছা না করলেও আপনা থেকে কোন্ কোন্ পেশী কাজ করে?



আমাদের হৃদপিন্ড যে ধুকধুক করে সে কথা কখনও আমরা ভাবি কি? শ্বাসযন্ত্র যে কাজ করে যাচ্ছে সেটা আমাদের ইচ্ছামতো কি? আমাদের খাদ্য যে দেহের মধ্যে গিয়ে পরিপাক হ'চ্ছে সে সম্বন্ধে ভাবতে হয় কি? আমরা যখন ঘুমিয়ে থাকি তখনও ত' এসব কাজ চলতে থাকে। আমাদের হৃদযন্ত্রকে

আমরা ইচ্ছামতো থামিয়ে দিতে পারি কি? শ্বাসযন্ত্রকে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ থেকে বিরত করতে পারি কি? পরিপাক ক্রিয়াকে কি হুকুম করা যায় যে তুমি থেমে যাও?

এসব কাজের একটাকেও আমরা ইচ্ছামত থামাতে পারি না। পেশীরা তাদের নিয়ন্ত্রণ করে। এসব পেশী আমাদের ইচ্ছামত কাজ করে না।

আমরা কি শিখলাম?

১। মস্তিষ্ক, স্নায়ুরজ্জু ও স্নায়ুজাল দিয়ে দেহের স্নায়ুতন্ত্র গঠিত।

২। দু' রকমের স্নায়ু আছে—অনুভূতিবাহী (সেনসরি) ও আজ্ঞাবাহী (মোটর)।

৩। অনুভূতিবাহী স্নায়ু পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কাছ থেকে অনুভূতিটা নিয়ে মস্তিষ্কে পেঁাছিয়ে দেয়।

৪। আজ্ঞাবাহী স্নায়ু মস্তিষ্কের কাছ থেকে আদেশ নিয়ে পেশীতে পেঁাছিয়ে দেয়।

৫। আমাদের দেহে পাঁচটি বিভিন্ন ইন্দ্রিয় আছে—

(ক) ত্বক বা চর্ম আমাদের স্পর্শ জ্ঞান দেয়

(খ) চোখ দিয়ে আমরা দেখতে পাই

(গ) কান দিয়ে আমরা শুনতে পাই

(ঘ) নাক দিয়ে আমরা গন্ধ পাই

(ঙ) জিভের সাহায্যে আমরা আস্বাদ জানতে পারি।

৬। ইন্দ্রিয়গুলিকে এমনভাবে রক্ষা করতে হবে যাতে ওগুলির কোন ব্যাধি বা ক্ষতি না হয়।

৭। দেহের মৃদু যন্ত্রগুলিকে হাড় দিয়ে রক্ষা করা হয়। মাথার খুলি মস্তিষ্ককে রক্ষা করে। পিঠের হাড় স্নায়ুরজ্জুকে রক্ষা করে।

৮। দেহের হাড়গুলিতে বিভিন্ন ধরনের জোড় আছে। তার ফলে দেহের বিভিন্ন অংশ নড়াচড়া করতে পারে।

৯। দেহের পেশীও দেহকে নড়াচড়া করতে বিশেষ সাহায্য করে।

১০। কোনো কোনো পেশী আমাদের ইচ্ছা অনুসারে সংকুচিত বা প্রসারিত হয়। অন্যগুলি নিজেদের কর্তব্য ক'রে যায়—আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর তারা নির্ভর করে না।

প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হবে—

১। প্রত্যেকটি প্রশ্নের তিনটি ক'রে উত্তর দেওয়া আছে। উত্তর তিনটির মধ্যে যেটি তোমার সঠিক ব'লে মনে হবে, তার পাশে একটা ক'রে টিক্ মার্ক দাও—

(ক) চোখে যখন আমরা কিছু দেখি, তখন একমাত্র চোখটাই তা' দেখায় না। দেখবার জন্য চোখের চাই—

(১) চোখকে রক্ষা করবার জন্য চোখের পাতা

(২) মস্তিষ্কের সংগে সংযুক্ত অনুভূতিবাহী স্নায়ু

(৩) দেখবার জন্য সঠিক কিছু আকার।

(খ) অন্ধলোক হাতে কোনও মুদ্রা পেলে ব'লে দিতে পারে সেটা কি। হাত দিয়ে সেটা জানা যায়, কারণ

(১) হাতের অনুভূতিবাহী স্নায়ু মুদ্রাটির আকারটা মস্কিষ্কে পেঁছিয়ে দেয়

(২) হাত দিয়ে মুদ্রাটির ওজন বুঝতে পারে

(৩) কোন কোন মুদ্রা নরম এবং কোন কোনটা শক্ত

(গ) চোখের ব্যাধি প্রায়ই এক ব্যক্তির কাছ থেকে অন্য ব্যক্তির চোখে যায়।

(১) অসুস্থ ব্যক্তির চোখের দিকে তাকানো হয় ব'লে

(২) ঐ ব্যক্তির ব্যবহৃত রুমাল বা তোয়ালে ব্যবহার করা হয় ব'লে

(৩) বায়ুস্রোত ঘরের মধ্যে প্রবাহিত হয় ব'লে।

স্বাস্থ্যবিধি :

১। সাধারণের ব্যবহৃত জায়গায় প্রস্রাব করা বা থুথু ফেলা উচিত নয়। এর থেকে ব্যাধি ছড়িয়ে পড়তে পারে।

২। জঞ্জাল ঠিক জঞ্জাল ফেলবার জায়গায় ফেলতে হবে। ওগুলি রাস্তায় বা অন্য খোলা জায়গায়, যেখানে মাছি বসে, সেখানে ফেলতে নেই। মাছিতে ব্যাধি ছড়িয়ে দেয়।

৩। খোলা-মুখ কুয়ায় যাতে অপরিষ্কার কিছু না পড়তে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। নদী বা পুকুরের জল পান করবার আগে ফুটিয়ে নেওয়া উচিত।

৪। ধুলো-বালি মাখা বা মাছি-বসা অপরিষ্কার খাদ্য স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। খাদ্যে যাতে মাছি না বসে বা ধুলো না পড়ে তা দেখতে হবে।

৫। কাঁচা ফল বা শাক-সব্জী খাওয়ার আগে ভালো ক'রে ধুয়ে নিতে হবে।

৬। যথারীতি স্নান করে শরীরকে পরিষ্কার রাখা উচিত।

৭। খাওয়ার পর সর্বদা দাঁত মাজা দরকার।

৮। যাতে কোন ব্যাধি না হ'তে পারে সেজন্য চোখ, কান ও নাক পরিষ্কার রাখতে হবে।

सत्यमेव जयते